শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের করুণ কাহিনি

ইতিহাসের কান্না



মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের করুণ কাহিনি

ইতিহাসের কান্না

রূপান্তর ও সম্পাদনা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন
ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

ইতিহাসের কান্না

মূল — মুসাব্বিরে ফিৎরত খাজা হাসান নিজামী

রূপান্তর ও সম্পাদনা — মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

রাহনুমা প্রথম প্রকাশ — জুন ২০১৬

প্রচ্ছদ — মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম

মুদ্রণ — শাহরিয়ার প্রিন্টিং প্রেস
৪/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০

একমাত্র পরিবেশক — রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১২০.০০ (একশো বিশ টাকা মাত্র)

ETIHASER KANNA
Written by : Khaza Hassan Nizami, Translated by : Mawlana Ubaidur Rahman Khan Nadwi
Marketed & Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk.120.00, US $ 8.00 only.

ISBN: 978-984-92211-4-2
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com
web : www.rahnumabd.com

অর্পণ

ফারহাত জাহান সানিয়া

আমার কোনো বই বেরুলে সবার আগে বইটি
যে পড়ে ফেলে এবং
যার সরল ধারণায়—তার বড় মামা মস্ত বড়
এক লেখক।

ইতিহাসের কান্নার লেখক

দিল্লির অসাধারণ সাহিত্য-প্রতিভা খাজা হাসান নিজামী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৫৫ সালে। তিনি ৫০০-এর বেশি বই লিখেছেন। উর্দুভাষী এ লেখকের ভাষাশৈলী অদ্বিতীয়। দিল্লির চলিত ভাষায় তাঁর বর্ণনাধর্মী লেখা পাঠকের অন্তরে গভীর ছাপ রেখে যায়। অবস্থার চিত্রায়ণ বা প্রকৃতির প্রতিচ্ছবিতে দক্ষতার জন্যে তাঁকে 'মুসাব্বিরে ফিৎরত' বলা হয়।

খাজা হাজান নিজামীর শৈশব কাটে দিল্লির ক্ষমতাচ্যুত উৎপীড়িত তৈমুর বংশীয় শাহজাদাদের সাথে, যারা লাল কেল্লার প্রাসাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে নিজামুদ্দীন বস্তিতে জীবন কাটাচ্ছিলেন। যুগের চাকায় নিপিষ্ট, নিয়তির নির্মম পরিহাসে নিষ্পেষিত এ ভাগ্যাহতদের সান্নিধ্য তাঁকে ভীষণ আবেগাপ্লুত করে। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে-শুনে অনেকগুলো বই লেখেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বই *বেগমাত কে আঁসু* বা *রাজমহীষীদের অশ্রুধারায়* ১৮৫৭ সালের অনেক ঘটনার উল্লেখ আছে। সে বই থেকেই কয়েকটি পর্ব এ পুস্তকে সন্নিবেশিত হয়েছে।

খাজা নিজামীর এ বইটি বৃটিশ আমলে কয়েকবার বাজেয়াপ্ত হয়। অতঃপর ভারত স্বাধীন হলে এর অগণিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে এ বইয়ের এই প্রথম প্রকাশ। অবশ্য *দৈনিক ইনকিলাবে* ধারাবাহিকভাবে এর কয়েকটি পর্ব ইতোপূর্বে ছাপা হয়। ধীরে ধীরে খাজা হাসান নিজামীর আরও বই প্রকাশের ইচ্ছা আমাদের রয়েছে।

-প্রথম প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

বৃহত্তর ময়মনসিংহের এক প্রতাপশালী জমিদারপুত্র—যিনি আমার মরহুম দাদাসাহেবের (১৯০৪-১৯৮২ খ্রি.) খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন—একবার আমাদের বাসায় এলেন। কান্তিময় চেহারা, শিষ্ট আচরণ আর দর্শনীয় আদব-লেহাজ। দাদাসাহেবকে পা ছুঁয়ে সালাম করলেন, হাতে চুমো খেয়ে হালাবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তা সেরে কিছুক্ষণ পর চলেও গেলেন। পরে দাদাসাহেব আমাদের এ জমিদারপুত্রের জীবন-ইতিহাস শুনিয়েছিলেন।

এরপর থেকে যখনই তিনি দাদাসাহেবের সাথে দেখা করতে আসতেন, আমরা একটু সচকিত হয়ে উঠতাম। তাঁকে দেখতাম, তাঁর কথাবার্তা লক্ষ করে শুনতাম। অতীত দিনের স্মৃতি, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি বিষয়েই কথা চলত। একদিন হয়তো বলতেন, 'আমাদের তৈজসপত্র সবই শেষ।' কোনোদিন বলতেন, 'সীমানা প্রাচীরের ইটগুলোও বিক্রি করা হয়েছে।' একদিন বলতেন, 'আমার গলার এ রূপার মাদুলি ছাড়া আমার আর কোনো সম্পদই নেই।'

সব সময়ই আমরা লক্ষ করতাম দাদাসাহেব এ জমিদার-তনয়কে খুব স্নেহ করতেন। খুব সহজ ভঙ্গিতে তাঁর পকেটে কিছু টাকা পয়সা ভরে দিতেন। একদিন এ মেহমানকে বিদায় করে দাদাসাহেব বাংলা ঘর থেকে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। খুব অনুভূতিপ্রবণ সত্তরোর্ধ্ব ব্যক্তি তিনি; এর ওপর উচ্চ রক্তচাপের রোগী। আমার আম্মাকে ডেকে বললেন, 'বৌ মা, ... কে আজ যাকাতের টাকা দিলাম। সে বলল, "যার তার কাছে তো আর আমাদের দুরবস্থার কথা বলতে পারি না।" ভাবছি তাদের সম্মান

হানি না হয় এমন কিছু উৎস থেকে তাকে কিছু সাহায্য করা যায় কিনা!' এরপর এ জমিদার পরিবারের অতীতপ্রসঙ্গে কিছু কথা বলে, এদের বর্তমান কষ্টের বিষয়েও বললেন। বললেন, 'ধনী মানুষ দরিদ্র হলে ভীষণ কষ্ট। আর সব সময়ই যারা অভাবী তাদের কাছে দারিদ্র্যের অনুভূতিটা তেমন প্রকট হয় না, যেমন হঠাৎ অভাবে পড়া ধনীদের কাছে হয়।'

তখন থেকেই এসব আমাকে খুব ভাবিত ও ভারাক্রান্ত করত। বড় হয়ে যখন লেখালেখির লাইনে এলাম তখন বহু ভেবেছি, এসব মানুষের বিপর্যয়ের ইতিহাস লিখব কি না। এসব ঘটনায় তো মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে।

এর অনেক পর আমি দিল্লি ভ্রমণে যাই। প্রথমবারের মতো আমাকে দিল্লির পুরোনো এলাকাগুলো ঘুরিয়ে দেখান দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তা সিরাজুল হক সাহেব। আজ আর তিনি ইহলোকে নেই। সিরাজ সাহেবের সাথে যখন দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদ দেখে ঐতিহাসিক লালকেল্লায় প্রবেশ করছি, তখন আমার মনে দ্রুত ভাবান্তর ঘটছে। বাবরের (১৪৮৩-১৫৩০ খ্রি.) সন্তানরা কী দাপটের সাথেই না শাসন করে গেছে আসমুদ্র হিমাচল এ ভূখণ্ড। গোটা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, উত্তর ভারত জুড়ে হুমায়ুন আর সর্বভারতীয় মোগল সাম্রাজ্যে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের উত্তাপ যেন আজও অনুভব করেন ইতিহাসমনা মানুষেরা। আগ্রা-ফতেহপুর আর দিল্লির পুরাকীর্তিগুলোই তো আজ ইতিহাসের এ অসাধারণ চরিত্রসমূহের স্মারকরূপে দাঁড়িয়ে।

রাজকীয়তার সকল ধারণা যেসব দরবারে পূর্ণত্ব লাভ করে সেসব স্বচক্ষে দেখে কতটা আবেগাপ্লুত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। তিন শতাধিক বছরের মহাপ্রতাপান্বিত মোগল সাম্রাজ্য প্রকৃতির নিয়মেই বিলুপ্ত আর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সর্বশেষ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর। হিন্দুস্থানের শাহানশাহকে পায়ে শেকল পরিয়ে তাঁরই পিতৃপুরুষের হাতে নির্মিত লাল কেল্লার বিচারমঞ্চে

হাজির করা হয়। বিচারে তাঁকে নির্বাসনের সাজা দেওয়া হয়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফর (১৭৭৫-১৮৬২ খ্রি.) নির্বাসনভূমি রেঙ্গুনেই দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবরও সেখানেই রচিত হয়।

মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফর একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। 'যাফর' তাঁর কবি নাম। জীবনের শেষলগ্নে ইংরেজদের হাতে সীমাহীন লাঞ্ছিত হওয়ার ফলে তিনি প্রায় নির্বাক হয়ে যান। দুঃখের যেসব কবিতা তাঁর শেষজীবনে রচনা করতেন সেগুলো আজও উর্দু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। বাপ-দাদার সাম্রাজ্য হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার পর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অজ্ঞাতবাসে মৃত্যুবরণ যে কত বেদনার তা কেবল আরেকজন হতভাগ্য শাহানশাহের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

তাঁর কবিতায় এ মর্মে একটি পঙ্‌ক্তি আছে :

'ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরও আমায় কেউ যেন উৎপীড়ন করছে—
কেউ যেন আমার কবরের চিহ্নটুকুও মাটিতে মিশিয়ে একাকার করে দিচ্ছে।'

মৃত্যুর পূর্বে তাঁর এক কবিতায় তিনি বলেছিলেন :

'কতই না হতভাগা তুমি হে যাফর, স্বদেশের বুকে পরিজনের সান্নিধ্যে কবরের দুগজ মাটিও তোমার কপালে জুটল না।'

বেশ কয়বছর আগে শুনেছিলাম, কলকাতার মেটিয়া বুরুজ এলাকায় মোগল রাজবংশের অধঃপুরুষ কেউ একজন বসত করতেন। এবং তিনি সরকারি এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আধুনিক ভারতে এটি কোনো সংবাদ নয়।

ঢাকার জনৈক প্রবীণ একদিন গল্পচ্ছলে আমাকে বললেন, 'যৌবনে তিনি দিল্লি ভ্রমণে গেলে স্থানীয় গাইডেরা তাঁকে লাল কেল্লার অদূরবর্তী এক বস্তিতে নিয়ে যায়। উদ্দেশ্য মোগল বাদশাহদের বংশধর এ বস্তিতে অনেকেই থাকেন। দর্শনার্থীদের তাঁরা সাক্ষাৎও দেন। যদি দেখা হয়ে যায়!'

একটি ঘরের সামনে গিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে গাইড আবেদন জানায়, 'সুদূর ঢাকা থেকে জনৈক দর্শনার্থী এসেছেন, যদি তাঁরা কেউ দর্শন দান করেন!' তখন বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঢাকার এ প্রবীণ তাঁকে সালাম করলে তিনি কাঁধের গামছাটি মাটিতে বিছিয়ে চারজানু হয়ে বসলেন এবং বললেন, 'ওয়া আলাইকুম সালাম'। এরপর ধীর পায়ে ফিরে গেলেন ঘরে। ইনি ফিরে যাওয়ার পর পর্যটক ব্যক্তিটি ইচ্ছে করলেন তাঁকে কিছু হাদিয়া দিতে। বিষয়টি গাইডকে বললে সে জানাল, 'এখন আর টাকা দেওয়ার উপায় নেই। বৃদ্ধ শাহজাদা সাহেব যখন গামছায় তশরীফ রেখেছিলেন তখন হাদিয়াটুকু তাঁর গামছার এক প্রান্তে বা-আদব বা-মোলাহাযা রেখে দিলে হয়তো তিনি তা গ্রহণ করতেন কিন্তু এখন আর এ টাকা তাঁকে কোনোক্রমেই দেয়া যাবে না।'

আবাল্য অনুসন্ধিৎসার টানেই হয়তো শত শত বছরের শাসন-ঐতিহ্য নিয়ে বেড়ে ওঠা শেষ মোগল সম্রাট পরিবারের ওপর সিপাহী বিপ্লবোত্তর কালে ইংরেজ শাসকদের অবর্ণনীয় অত্যাচার এবং এ পরিবারের সদস্যদের ভাগ্য বিপর্যয়ের ওপর রচিত ঐতিহাসিক কিছু পুস্তক আমার সংগ্রহে আসে। একসময় বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে এর কিছু অংশের ভাষান্তরও করা হয়। আশা করি এ দেশের ইতিহাস-আশ্রিত সাহিত্যের অঙ্গনে এ পুস্তক স্থায়ী আসন করে নেবে।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
২৩ জুন, ২০০০

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বহুবছর পর বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। নানা কারণে কিছুকাল লেখালেখি ও প্রকাশনা থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে হয়। রাহনুমার আগ্রহ ও সাথীদের উৎসাহে নতুন করে পুরোনো এসব বই আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সব ধরনের কল্যাণে ভরপুর করে দিন।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
১০ রমযান, ১৪৩৭

সূচিপত্র

কুলসুম যমানী বেগম

এক নিরুপায় দরবেশ-নারীর বিপন্ন অবস্থার সত্য কাহিনি এটি, যাঁর ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল যুগবদলের প্রবল ঝাপটা। তাঁর নাম ছিল কুলসুম যমানী বেগম। ইনি ছিলেন দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরের[১] আদুরে কন্যা।

কয়েক বছর হলো তিনি মারা গেছেন। কয়েকবার আমি নিজে শাহজাদী সাহেবার মুখে তাঁর অবস্থার কথা শুনেছি। কেননা, আমাদের হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়া মাহবুবে ইলাহীর প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ভক্তি। সেজন্য প্রায়ই তিনি দরগাহে আসতেন এবং আমি করুণ কাহিনি শোনার সুযোগ পেয়ে যেতাম। নিচে যতগুলো ঘটনা বলা হয়েছে তা হয় স্বয়ং তিনি নয়তো তাঁর কন্যা যীনাত যমানী বেগম আমাকে শুনিয়েছেন। যীনাত যমানী বেগম এখনো জীবিত এবং পণ্ডিতের গলিতে থাকেন। ঘটনাগুলো এ রকমের :

যে সময় আমার পূর্বপুরুষের বাদশাহী শেষ হলো এবং সিংহাসন মুকুট লুণ্ঠিত হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল, সে সময় দিল্লির লাল কেল্লায় কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেছে। চারিদিকে কেউ কিছু খায়নি। যীনাত আমার কোলে, দেড় বছরের শিশু দুধের জন্য কাঁদছিল। ভাবনা-চিন্তায় না আমার বুকে দুধ ছিল, না কোনো ধাইয়ের। আমরা সবাই যখন এমনই বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে বসেছিলাম, জিল্লে সোবহানীর (মোগল যুগে বাদশাহকে এই উপাধিতেই সম্বোধন করা হতো। অর্থ : মহান আল্লাহর আশিসপূর্ণ ছায়া) বিশেষ খোজা আমাদের ডাকতে এল।

---

১. খাজা হাসান নিজামী তার মূল উর্দু বইয়ে লিখেছেন, 'আবু যাফর বাহাদুর শাহ।' নামটি 'বাহাদুর শাহ যাফর' রূপেই প্রসিদ্ধ বলে এ তর্জমায় আমরা এভাবেই লিখলাম। –অনুবাদক।

মধ্যরাত্রি, নিস্তব্ধতার পরিবেশ, গোলাগুলির নির্ঘোষে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে কিন্তু বাদশাহর হুকুম পাওয়ামাত্রই আমরা হাজিরি দিতে পৌঁছে গেলাম। হুজুর তখন বসে। হাতে তসবীহ। যখন আমি সামনে গিয়ে মাথা নত করে তিনবার সালাম আরয করলাম, হুজুর আমাকে বড় স্নেহে কাছে ডাকলেন ও বললেন, 'কুলসুম, তোমাকে আমি খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে এক্ষুণি কোথাও বেরিয়ে পড়ো। আমিও যাব। মন তো চায় না যে, এই শেষ সময় তোমাদের চোখের আড়াল করি কিন্তু সঙ্গে রাখলে তোমার ক্ষতি হওয়ার ভয় রয়েছে। আলাদা থাকলে হয়তো খোদা তোমাদের কোনো ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।'

এই বলে হুজুর তাঁর হস্ত মোবারক যা কাঁপুনিরোগে কাঁপছিল ওপরে ওঠান ও অনেকক্ষণ ধরে উঁচু গলায় আল্লাহর কাছে দুআ করতে থাকেন :

'খোদা তাআলা এই বেওয়ারিস বাচ্চাদের তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। রাজমহলে যারা বাস করত, তারা আজ জনহীন জঙ্গলে যাচ্ছে। দুনিয়াতে এদের সাহায্য করার কেউ নেই। তৈমুর নামের মর্যাদা রক্ষা করো এবং এই নিরাশ্রয় নারীদের ইজ্জত বাঁচিয়ো। হে পরোয়ারদেগার, শুধু এই নয়, বরঞ্চ সমস্ত হিন্দুস্তানের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান আমার সন্তান এবং সবারই আজ বিপদ। আমি অপয়া, আমার কর্মদোষে এদের মানহানি কোরো না বরং সবাইকে কষ্ট-হয়রানি থেকে মুক্তি দাও।'

তারপর তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। যীনাতকে আদর করলেন ও আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীনকে কিছু গয়নাগাঁটি দিয়ে নূরমহল সাহেবাকে আমাদের পথের সঙ্গিনী করে দিলেন। নূরমহল ছিলেন হুজুরের বেগম।

শেষরাতে কেল্লা থেকে বের হয় আমাদের কাফেলা। দুজন পুরুষ ও তিন জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে একজন আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন এবং অন্যজন মির্জা উমর সুলতান—যিনি ছিলেন বাদশার ভগ্নীপতি। মেয়েদের মধ্যে এক আমি, দ্বিতীয় নবাব নূরমহল এবং তৃতীয় জন বাদশাহর বেয়াইন হাফিজ সুলতান। যে সময় আমরা ঘোড়াগাড়িতে বসি, সেটা রাত্রির শেষ প্রহর। সমস্ত তারাই অদৃশ্য, শুধু শুকতারা ঝিলমিল করছিল। আমরা যখন

আমাদের সাজানো সংসার ও সুলতানী মহলের দিকে শেষবার তাকালাম, বুক টনটনিয়ে উঠল। আমাদের চোখ ফেটে পানি এল। নবাব মহলের চোখও অশ্রুসজল। শুকতারার ঝিলিক ধরা দিয়েছে নূরমহলের চোখে।

শেষ পর্যন্ত লালকেল্লা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে কোরালি গ্রামে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমাদের গাড়িচালকের বাড়িতে নামলাম। খেতে পেলাম বাজরার রুটি ও ঘোল। সে সময় খিদের চোটে তাও বিরিয়ানি পোলাওর চেয়ে বেশি স্বাদ লাগল। একদিন কেটে গেল শান্তিতে। কিন্তু পরের দিন জাঠ ও গুজররা জড়ো হয়ে কোরালি লুঠ করতে চড়াও হলো। তাদের সঙ্গে শত শত মেয়েলোকও ছিল। তারা ডাইনিদের মতো আমাদের ছেঁকে ধরল। সমস্ত গয়নাগাঁটি ও কাপড়-চোপড় ওরা খুলে নিল। যে সময় এই দুর্গন্ধময় পঁচা মেয়েলোকগুলো তাদের নোংরা হাত দিয়ে আমাদের গলা খুবলে খুবলে দিচ্ছিল, তখন তাদের ঘাগরা থেকে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছিল যে আমাদের দম আটকে আটকে যাচ্ছিল। এই লুঠের পরে আমাদের কাছে এতটুকুও কিছু অবশিষ্ট রইল না যাতে একবেলার খাবার জোটে। আমরা তখন বিহ্বল, না জানি এবার কী হয়! তেষ্টায় যীনাত কাঁদছিল। সামনে দিয়ে একজন কৃষক যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে তাকে ডাক দিলাম, 'ভাই, এই বাচ্চাটাকে একটু পানি এনে দাও।' কৃষকটি তক্ষুণি গিয়ে মাটির পাত্রে পানি নিয়ে এল। বলল, 'আজ থেকে তুই আমার বোন ও আমি তোর ভাই।' এই কৃষক কোরালি গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নাম ছিল বস্তি। সে তার গরুর গাড়ি জুতে আমাদের সবাইকে বসিয়ে বলে, 'যেখানে বলবে সেখানে পৌছে দেব।' আমরা বলি, 'মীরাট জেলায় অজারাতে মীর ফয়েজ আলী শাহী হাকিম থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের বেশ ভালো সম্পর্ক। সেখানে নিয়ে চলো।' বস্তি আমাদের অজারাতে নিয়ে গেল। কিন্তু মীর ফয়েজ আলী চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার করলেন। সোজা কানের ওপর হাত রেখে বললেন, তোমাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমার ঘর-গেরস্তালি নষ্ট হতে দিতে পারি না।

(মীর ফয়েজ আলীর ছেলে যখন এই বই পড়েন, তখন বলেন যে বেগম সাহেবার বক্তব্য ঠিক নয়। মীর ফয়েজ আলী তাদের সবাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন।)

ঘন নিরাশায় ভরা সময় ছিল সেটা। একে তো ভয়, পেছন থেকে ইংরেজ সৈন্য এল বুঝি। তার ওপর আমাদের অবস্থা এতই খারাপ যে, সবাই বিরূপ। যারা আমাদের চোখের ইশারায় চলত আর সবসময় চৌকস থাকত যে আমাদের হুকুম পাওয়ামাত্রই যেন তা তামিল হয়, তারাই আজ আমাদের মুখদর্শন করতে চায় না। কৃষক বস্তিকে ধন্যবাদ যে সে তার ধর্ম-বোনকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে। নিরুপায় আমরা অজারা থেকে রওনা হলাম ও হায়দ্রাবাদের পথ ধরলাম। মেয়েরা বস্তির গরুর গাড়িতে ও পুরুষরা পায়ে হেঁটে। তৃতীয় দিন পৌঁছলাম এক নদীর তীরে, যেখানে কোয়লের নবাবের বাহিনী শিবির গেড়ে অবস্থান করছিল। তারা যখন শুনল, আমরা শাহী খানদানের লোক, তখন তারা খুব খাতিরযত্ন করল আর হাতিতে বসিয়ে নদী পার করে দিয়ে গেল। আমরা নদীর অন্য পারে নামামাত্র সামনে থেকে সৈন্য এসে পৌঁছল ও নবাবের সৈন্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেঁধে গেল।

আমার স্বামী ও মির্জা উমর সুলতান চাইছিলেন নবাবের সৈন্যে যোগদান করে যুদ্ধ করতে। কিন্তু রিসালদার বলে পাঠালেন, 'আপনারা মেয়েদের নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। আমরা যেমন করে হোক মোকাবিলা করব। সামনে ছিল খেত আর তাতে পাকা ফসল। আমরা তার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। জানি না সেই নিষ্ঠুররা দেখে ফেলেছিল কি না—হয়তো বা হঠাৎই গুলি এসে লাগল। যাই হোক, একটা গোলা খেতের মধ্যে এসে পড়ায় সমস্ত খেত দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে পালাই আমরা। কিন্তু হায়! কী বিপদ, আমরা পালাতেও জানি না। ঘাসে পা জড়িয়ে যাওয়ায় বারেবারে আছাড় খেয়ে পড়ি। মাথা ঢাকবার ওড়না ওখানেই পড়ে রইল। অনাবৃত মাথায়, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়া অবস্থায় অনেক কষ্টে খেত থেকে বের হয়ে এলাম। আমার ও নবাব মহলের পা রক্তাক্ত। তেষ্টায় মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে আসছে। যীনাত বারে বারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। পুরুষরা আমাদের সামলাচ্ছেন কিন্তু আমাদের সামলানো কি চাট্টিখানি কথা!

খেত থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নবাব নূরমহল মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। যীনাতকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমি আমার

স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ আমরা যাই কোথায়। কোনো ভরসাই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্য এমনই পাল্টাল যে শাহী মহল থেকে ফকিরীতে নেমে এলাম। কিন্তু ফকিররা তো শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। আমাদের ভাগ্যে তাও নেই।

সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বস্তি গিয়ে নদী থেকে পানি আনে। আমরা পানি খেলাম ও নবাব নূরমহলের মুখের ওপর পানির ছিটে দেয়া হলো। নূরমহল কাঁদতে শুরু করেন। বলেন, এখুনি স্বপ্নে তোমার বাবা জিল্লে সোবহানীকে দেখলাম। তিনি শেকলে বাঁধা দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন :

'আজ আমাদের মতো গরিবের জন্য কাঁটায় ভরা ধুলোয় বিছানা মখমলের ফরশ থেকে ঢের ভালো। নূরমহল, ব্যাকুল হোয়ো না। সাহসে বুক বেঁধে কাজ করো। নসীবের লিখন, বার্ধক্যে এইসব কঠোরতা সহ্য করো। আমার কুলসুমকে একটু দেখিয়ে দাও। জেলখানায় যাওয়ার আগে তাকে একবার দেখতে চাই।'

বাদশাহর এই সব কথা শুনে আমার মুখ থেকে 'হায়' বেরিয়ে এল আর ঘুম ভেঙে গেল। কুলসুম, সত্যি কি বাদশাহকে শেকলে বেঁধেছে? সত্যিই কি ওরা তাঁকে কয়েদীদের মতো জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে? মির্জা উমর সুলতান জবাব দিলেন, 'এ তোমার নিছক খেয়াল। বাদশাহরা বাদশাহদের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করে না। তুমি ভয় পেয়ো না। তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন।' বাদশাহর বেয়াইন হাফিজ সুলতান বললেন, 'এই মড়া ফিরিঙ্গিরা বাদশাহর মূল্য কী ছাই বুঝবে? তারা নিজেরাই তাদের সুলতানের মাথা কেটে ষোলো আনায় বিক্রি করে (রৌপ্যমুদ্রার প্রতি ইশারা, যাতে রাজার মাথার ছাপ থাকে- হাসান নিমাজী।) নূরমহল ফুফু, তুমি তো তাঁকে শেকল পরা অবস্থায় দেখেছ। আমি বলি, এই বেনে ফেরিঅলারা এর চেয়েও বেশি খারাপ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন আশ্বাসের কথা বলে সবাইকে শান্ত করেন।

এরই মধ্যে বস্তি নৌকোর ওপর গাড়ি চাপিয়ে এপারে নিয়ে আসে ও আমরা তাতে বসে রওনা হই। অনতিদূর যেতেই সন্ধ্যে নেমে আসে এবং আমাদের গাড়ি এক গাঁয়ে গিয়ে থামে। সেই গ্রামে মুসলমান রাজপুতদের বসতি। গাঁয়ের মোড়ল আমাদের জন্য একটি কুঁড়েঘর খালি করিয়ে দিল। তাতে শুকনো ঘাস ও খড়ের বিছানা পাতা। যাকে ওরা পিয়াল বা পরাল বলে সেই ঘাসের ওপরেই তারা ঘুমোয়। আমাদেরও বেশ খাতির করে (যা তাদের হিসেবে বেশ উঁচুদরের খাতির) তারা এই নরম বিছানা দিল।

আমার প্রাণ তো এই জঞ্জাল দেখে আইঢাই করতে থাকে। কিন্তু সে সময় করাই বা কী যায় অথবা কীইবা হতে পারত। বাধ্য হয়ে তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তির পর নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হওয়ার দরুন চোখে ঘুম নেমে আসে।

মাঝরাতে হঠাৎই সবার ঘুম ভেঙে গেল। ঘাসের শীষগুলো ছুঁচের মতো বিঁধছিল গায়ে। আর যেখানে-সেখানে ডাঁশের কামড়। সে সময় কী যে অস্বস্তি হচ্ছিল খোদাই জানেন। মখমলের বালিশ ও নরম তুলতুলে রেশমের বিছানার অভ্যেস আমাদের, তাই যা কিছু কষ্ট। নইলে আমাদের মতোই এ গ্রামে অন্য লোকেরা রয়েছে, যারা এই ঘাসের ওপরেই গভীর ঘুমে অচেতন। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক থেকে শেয়াল ডাকে আর আমার বুক ভয়ে কাঁপে। ভাগ্য পালটাতে দেরি হয় না। কে ভাবতে পারত যে, একদিন শাহানশাহে হিন্দের ছেলেপিলেরা এই ভাবে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইভাবে পদে পদে ভাগ্য বিড়ম্বনার তামাশা দেখতে দেখতে হায়দ্রাবাদ পৌঁছে গেলাম ও সীতারাম পেঠেতে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হলো। জব্বলপুরে আমার স্বামী একটি রত্নজড়িত আংটি বিক্রি করে দেন যেটি লুটপাট থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তাই দিয়ে পথের খরচ চলে আর এখানেও কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত যা কিছু কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এবার ভাবনা পেট ভরাবার কী ব্যবস্থা করা যায়। আমার স্বামী বেশ উঁচুদরের খোশনবীস তথা নন্দন লিপিকার ছিলেন। তিনি লতা-পাতা এঁকে সুন্দর লিখনে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারের গুণগান লিখলেন এবং

চারমিনারে সেটি বিক্রি করতে গেলেন। লোকেরা সেটা দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথম দিন সুন্দর করে আঁকা দুরূদ শরীফের দাম উঠল পাঁচ টাকা। তারপরে এমন হলো যে যখনই তিনি কিছু লিখতেন, তক্ষুনি তা বিক্রি হয়ে যেত। এই করে আমাদের দিন ভালোভাবেই কাটছিল। কিন্তু মুসা নদীর বন্যার ভয়ে আমরা দারোগা আহমদের বাড়িতে চলে এলাম। এই লোকটি ছিল মহামান্য নিজামের বিশেষ কর্মচারী।

কিছুদিন পরে গুজব রটল যে নবাব লশকর জঙ্গ যিনি শাহজাদাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন ইংরেজদের কোপভাজন হয়েছেন এবং এখন কোনো লোকই দিল্লির শাহজাদাদের আশ্রয় দেবে না। বরঞ্চ যদি কোনো শাহজাদার খবর পাওয়া যায়, তাহলে তাকে ধরার চেষ্টা করা হবে। আমরা সবাই এই খবরে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি স্বামীকে বাইরে বেরুতে বাধা দিলাম, যদি কোনো শত্রু ওঁকে ধরিয়ে দেয়। বাড়িতে বসে বসে যখন অনাহারের পালা এসে পড়ে, তখন নিরুপায় হয়ে একজন নবাবের ছেলেকে কুরআন শরীফ পড়াবার চাকরি আমার স্বামী মাসিক বারো টাকা মাইনেতে নিলেন। তিনি চুপি চুপি তার বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে ফিরে আসতেন কিন্তু সেই নবাব এমন বদ-মেজাজি ও খারাপ লোক ছিলেন যে আমার স্বামীর সঙ্গে সর্বদা সাধারণ চাকরের মতো ব্যবহার করতেন, যা তাঁর পক্ষে বরদাশত করা খুবই কঠিন ছিল। তিনি বাড়ি ফিরে কেঁদে কেঁদে দুআ চাইতেন, 'হে আল্লাহ, এই অপমানের চাকরি থেকে তো মৃত্যু অনেক ভালো। তুমি আমাকে এমনই ভিখিরি করে দিলে? কাল পর্যন্ত ঐ নবাবের মতো লোক আমাদের গোলাম ছিল আর আজ আমিই তার গোলাম।'

এরই মধ্যে কেউ গিয়ে নাজিমুদ্দীন সাহেবকে আমাদের কথা বলে। হায়দ্রাবাদে মিয়ার খুব সম্মান ছিল। কেননা, মিয়া হযরত কালে মিয়া সাহেব চিশতি নিজামী ফখরীর ছেলে যাঁকে দিল্লির বাদশাহ ও নিজাম নিজেদের পীর বলে মানতেন। মিয়া রাত্রে আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের দেখে খুব কাঁদলেন। একসময় ছিল যখন তিনি কেল্লায় আসতেন, তখন তাঁকে সোনার জরির কাজ করা মসনদে বসানো হতো। বাদশাহ-বেগম নিজের হাতে বান্দা-

বাঁদির মতো সেবা করতেন। আজ যখন তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন ছেঁড়া চটও ছিল না যে তাঁকে বসতে দিই। বিগত দিনগুলো চোখের সামনে ভাসতে থাকে। খোদার দেওয়া জাঁকজমক কী ছিল আর কী হয়ে গেল! মিয়া অনেকক্ষণ ধরে হালচাল জিজ্ঞেস করতে থাকেন। তারপর বিদায় নেন।

সকাল বেলা তাঁর বার্তা পেলাম, আমি খরচপত্রের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি, এবার তুমি হজ করার সংকল্প নাও। তাই শুনে মন খুশিতে ভরে ওঠে ও পুণ্যতীর্থ মক্কার জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, হায়দ্রাবাদ থেকে রওনা হয়ে বোম্বাই এলাম এবং এখান থেকে আমাদের প্রকৃত দরদি ও সঙ্গী বস্তিকে খরচপাতি দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। জাহাজে তো বসলাম কিন্তু যে যাত্রীই শোনে যে আমরা হিন্দুস্থানের বাদশাহ-বংশের, সেই আমাদের দেখার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। সে সময় আমরা সবাই দরবেশের পোশাকে। একজন হিন্দু যার বোধ হয় এডেনে দোকান ছিল এবং আমাদের বিষয়ে কিছু জানত না, জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কোন পন্থের ফকির।' তার প্রশ্ন আমাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে নুনের ছিটের মতো এসে লাগে। আমি বলি, 'আমরা মজলুম (উৎপীড়িত) শাহ পীরের মুরিদ। তিনিই আমাদের বাপ, তিনিই আমাদের গুরু। পাপীরা তাঁর ঘরদোর কেড়ে তাঁর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আমাদের মুখ দেখার জন্য লালায়িত আর তাঁর দর্শনের জন্য আমরা আকুলি-বিকুলি করছি।'

নিজেদের ফকিরি দশার বিষয়ে এর চেয়ে বেশি আর কী বলা যায়। যখন সে আমাদের আসল পরিচয় পেল, এসে বলল, 'বাহাদুরশাহ আমাদের সকলেরই গুরু এবং বাপ। কিন্তু কী করা যায় যখন নিষ্পাপ ব্যক্তির উচ্ছেদই রামচন্দ্রজীর মর্জি।'

মক্কায় পৌঁছলাম তো আল্লাহ পাক আমাদের থাকার এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করে দিলেন। আব্দুল কাদের নামে আমার এক গোলাম ছিল যাঁকে মুক্ত করে আমি মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে এসে সে অনেক ধনসম্পত্তি উপার্জন করে এবং জমজমের পাহারাদার হয়ে যায়। আমাদের আসার খবর পেয়ে সে ছুটে এসে পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার বাড়ি ছিল খুবই

ভালো ও আরামদায়ক। আমরা সবাই সেখানেই আশ্রয় নিই। কিছুদিন পরে রুমী সুলতানের নায়েব, যে মক্কায় বাস করত, খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। কেউ তাকে বলেছিল যে দিল্লির বাদশাহর মেয়ে এসেছে। পর্দা না করেই কথা বলে। নায়েব সুলতান আব্দুল কাদেরের মারফত দেখা করার জন্য খবর পাঠাল। আমি তার আবেদন মঞ্জুর করলাম।

পরদিন সে আমার বাড়ি এল এবং আদবকায়দা মাফিক ও বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। শেষে সে তার ইচ্ছা জানাল যে, সে আমাদের আসার খবর হুজুর সুলতানকে দিতে চায়। ওকে উত্তর আমি খুবই অবহেলায় দিলাম, আমরা সবাই এখন অনেক বড় সুলতানের দরবারে এসেছি। আর আমাদের অন্য কোনো সুলতানের পরোয়া নেই। নায়েব আমাদের খরচের জন্য বেশ ভালো অঙ্কের টাকা মঞ্জুর করে এবং আমরা নয় বছর মক্কা শরীফেই থেকে যাই। তারপর এক বছর বাগদাদ শরীফে, এক এক বছর নজফে আশরাফে ও কারবালায় কাটাই। এতদিন কেটে যাওয়ার পর শেষকালে দিল্লির স্মৃতি বড়ই ব্যাকুল করে তোলে। তখন দিল্লি ফিরে আসি। এখানে ইংরেজ সরকার ভীষণ দয়ার্দ্র হয়ে মাসিক দশ টাকা পেনশন মঞ্জুর করে। পেনশনের টাকার পরিমাণ শুনে খুব হাসি পেল। আমার বাবার এক বিশাল সাম্রাজ্য কেড়ে নিয়ে দশ টাকা ক্ষতিপূরণ! তারপর খেয়াল হলো, দেশ তো খোদার, কারোর বাপের নয়, তিনি যাকে চান তাকে দেন। যার কাছ থেকে ইচ্ছে কেড়ে নেন। মানুষের তো তাতে কিছুই করার নেই।

গুলবানু

আল্লাহর রহমতে গুলবানু পনেরো বছরের হলো। যৌবনের রাতগুলো তাকে কোলে নিয়ে দোলা দেয়, মনোরথ পূর্ণ হওয়ার দিনগুলো শরীরে সুড়সুড়ি জাগায়। মির্জা দারা বখত বাহাদুর সাবেক ওলী আহাদ (ভূতপূর্ব যুবরাজ) বাহাদুর শাহর ছেলে। বাবা তাকে বড়ই আদরে-সোহাগে প্রতিপালন করছিলেন আর তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে কবরে গেলেন গুলবানুর সেবাযত্ন আগের চেয়ে বেড়ে গেল। মা বলেন, ক্ষুদে অভাগীটা বুকে বড় ব্যথা পেয়েছে। বাপের জন্য ভেঙে না পড়ে। এমনভাবে একে ভুলিয়ে রাখো যে তাঁর ভালোবাসার কথা যেন ভুলে যায়।

এদিকে দাদাসাহেব অর্থাৎ বাদশাহ বাহাদুরশাহর অবস্থা এই যে পৌত্রীর আদর-সোহাগের ব্যাপারে তিনি কিছুতেই পিছপা নন। নবাব যীনাত মহল তাঁর অতি প্রিয়পাত্রী ও নজর-কাড়া স্ত্রী। জওয়ান বখত তাঁরই পেটের শাহজাদা। যদিও মির্জা দারা বখতের অসময়ে মারা যাওয়ার দরুন ওলী আহাদের পদটা মির্জা ফখরু পেয়েছে কিন্তু জওয়ান বখতের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে ওলী আহাদের কোনো তুলনাই হয় না। আর যীনাত মহল তলে তলে ইংরেজদের সঙ্গে জওয়ান বখতকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্ত চালাচ্ছেন। জওয়ান বখতের এমন ধুমধাড়াক্কার বিয়ে হলো যে মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে এরকম জাঁকজমকের জুড়ি মেলা ভার। কবি মির্জা গালিব ও ইবরাহীম যওক রচনা করেন সেহরা (বিবাহের শুভ গীত) এবং তাতে তাঁদের মধ্যে কবিয়ালীর সেই প্রসিদ্ধ রেষারেষির সংকেত থাকে যার উল্লেখ শামসুল উলামা আযাদ দেহলবী তাঁর বই *আবে হায়াত*-এ করেছেন। গালিবকে তাই বাধ্য হয়ে লিখতে হয় যে 'কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে কিছু অপমানজনক কথা যদিও বলা হয়েছে, এমনিতে ওস্তাদ যওকের সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই।'

এসব তো ছিলই তা ছাড়া জওয়ান বখত ও যীনাত মহলের সামনে সবাই ছিল নিষ্প্রভ। কিন্তু গুলবানুর ব্যাপার ছিল সবচেয়ে আলাদা। এই এতিম মেয়েটির প্রতি বাহাদুরশাহর যে ভালোবাসা ও অনুরাগ ছিল তাঁর সেরকম স্নেহ ও প্রীতি যীনাত মহল ও জওয়ান বখতও পায়নি। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে গুলবানু কেমন স্তরের জাঁকজমকে জীবনযাপন করত। মির্জা দারা বখতের আরও ছেলেমেয়ে ছিল কিন্তু গুলবানু ও তার মার প্রতি তার অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি।

গুলবানুর মা ছিল ডোমনি এবং মির্জা তাকে অন্য বেগমদের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। যখন তিনি মারা যান তখন গুলবানু ছিল বারো বছরের। দিল্লির হযরত মখদুম নাসীরুদ্দীন চেরাগের দরগাহতে তাঁকে কবর দেওয়া হয় যা দিল্লি থেকে ছয় মাইল দূরে পুরোনো দিল্লির ভগ্নাবশেষে অবস্থিত। গুলবানু প্রতি মাসে মাকে নিয়ে বাবার কবর দেখতে যেত। গেলেই কবর জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলত, ‘আব্বা, আমাকেও পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তুমি না থাকায় আমার মন কেমন করে।’

গুলবানু যখন পনেরোয় পা রাখে তখন যৌবন ছোটবেলার আব্দার ও দুষ্টুমি ভুলিয়ে দিলেও চঞ্চলতা এত বাড়িয়ে দেয় যে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করতে শুরু করে। সোনার পালঙে দোশালা (ছোট চাদর বিশেষ) মুড়ি দিয়ে ঘুমায়। সন্ধ্যে হলো বাতি জ্বলল আর বানু গিয়ে পালঙে শুয়ে পড়ল। মা বলেন, ‘সন্ধ্যা হতে না হতেই আদুরির গভীর রাত।’ শুনে একটু হেসে হাই তুলে আর আড়মোড়া ভেঙে মাথার ছড়িয়ে পড়া চুল গুটিয়ে নিয়ে বলে, ‘আচ্ছা মা, তোমার কী? ঘুমোই—সময় নষ্ট করি এতে তোমার কী ক্ষতি হয়?’ মা বলেন, ‘বানু, আমার ক্ষতির কী আছে? মনের সুখে বিশ্রাম করো তুমি। খোদা যেন সর্বদা তোমাকে সুখের ঘুম ঘুমোতে দেন। আমি বলতে চাই যে, বেশি ঘুম মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। সন্ধ্যেবেলা তুমি ঘুমিয়ে পড়ো তাই সকালে তাড়াতাড়ি ওঠা উচিত। কিন্তু তোমার অবস্থা ভাবো, দশটা বেজে যায় তবু বাঁদিরা টু শব্দটি করতে পারে না এই ভয়ে যে বানুর ঘুম না ভেঙে যায়। এমন ঘুমই বা কী? বাড়ির কাজকর্মও তো দেখা উচিত একটু। এখন আল্লাহর দয়ায়

তুমি কচি খুকিটি নও। পরের বাড়ি যেতে হবে। যদি এই অভ্যেসই থেকে যায় তাহলে কেমন করে দিন কাটবে?'

মায়ের এই ধরনের বক্তৃতা শুনে গুলবানু চটে উঠত, বলত, 'তুমি এসব ছাড়া অন্য কথা জানো না বুঝি? বলো না আমার সঙ্গে কথা। যদি চোখের বালি হয়ে গিয়ে থাকি তোমার স্পষ্ট বলো, আমি দাদা হযরত (বাহাদুরশাহ)-এর কাছে গিয়ে থাকি।

সেই সময়েরই কথা—শাহজাদা খিজির সুলতানের ছেলে মির্জা দাবর শুকোহ গুলবানুর কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করে। কেল্লাতে পরস্পরের মধ্যে পর্দা করার প্রথা ছিল দুর্বল। শাহী খানদানের লোকেরা নিজেদের মধ্যে কড়া পর্দা করত না। এই কারণে মির্জা দাবরের আসা-যাওয়া ছিল অব্যাহত।

* * *

গোড়ায় গুলবানু ছিল তার বোন ও সে ছিল তার ভাই। দুই চাচীর দুটি সন্তান বলেই তাদের লোকে ভাবত। কিন্তু ভালোবাসা অন্য এক সম্বন্ধ গড়ে তুলল। মির্জা গুলবানুকে অন্য কোনোভাবে নেয় আর গুলবানুও বাহ্য সম্পর্ক ছাড়াও তাকে অন্য একচোখে দেখতে শুরু করে।

একদিন সকালবেলা মির্জা গুলবানুর কাছে এসে দেখে, বানু কালো রঙের দোশালা মুড়ি দিয়ে সোনালি পালঙে ফুলের বিছানায় পা ছড়িয়ে ঘুমে অচেতন। মুখ হাঁ করা। নিজেরই হাতের ওপর মাথা। বালিশ আলাদা পড়ে। দুটো বাঁদ মাছি তাড়াচ্ছে।

দাবর শুকোহ চাচীর কাছে বসে গল্প করে ও আড়চোখে গুলবানুর অচৈতন্য অবস্থা দেখে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলে ওঠে, 'হা চাচীমা, হযরত বানু কী এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোয়? রোদ মাথার ওপর এসে গেছে। এবার ওকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত।'

চাচী বলেন, 'বাবা, বানুর মেজাজ তো জানোই। ওকে জাগিয়ে কে নিজের বিপদ ডেকে আনবে? ঝড় বইয়ে দেবে না?' দাবর বলে, 'দেখুন, আমিই জাগাচ্ছি। দেখি কী করে?' চাচী হেসে বলেন, 'জাগিয়ে দাও। তোমাকে আর

কী বলবে। তোমাকে ও বেশ মানে।' দাবর গিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়। বানু আড়ামোড়া ভেঙে পা গুটিয়ে নেয় এবং হঠাৎ চোখ তুলে খুব রাগী চোখে পায়ের দিকে তাকায়। মনে করেছিল কোনো বাঁদির বাঁদরামি। তার ধৃষ্টতার সাজা দিতে হবে। কিন্তু যখন সে এমন লোককে সামনে দেখতে পায় যার ভালোবাসায় তার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে, তখন সে লজ্জায় দোশালার আঁচল মুখের ওপর টেনে নেয় ও হড়বড়িয়ে উঠে বসে। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এই দৃশ্য দাবর থরোথরো বুকে দেখে ও চেচিয়ে ওঠে, 'এই নাও চাচীমা, আমি বানুকে জাগিয়ে দিয়েছি।'

ভালোবাসা অনেক এগিয়ে গেল। যখন প্রেমের দোলনায় দুলুনির গতি বাড়তে থাকে ও বিরহে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়, গুলবানুর মার সন্দেহ হয় এবং তিনি দাবর শুকোহকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দেন।

* * *

দিল্লির দরগা হযরত চেরাগের এক কোনায় বেশ সুন্দর দেখতে এক মহিলা ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত্রিবেলা হায় হায় করছিল। শীতকালের বৃষ্টি মুষলধারে পড়ছে। তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টির ছাট সেই জায়গাটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল যেখানে মহিলাটির বিছানা।

মহিলাটি খুবই অসুস্থ। পাঁজরায় ব্যথা, জ্বর এবং অসহায় অবস্থায় একা পড়ে কাতরাচ্ছে। জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় সে হাঁক লাগায়, 'গুলবদন, এই গুলবদন, মড়ি, কোথায় মরে আছিস। শীগ্‌গির আয়, আমাকে শাল মুড়ি দিয়ে দে। দেখিসনা না ছাট আসছে ভেতরে। পর্দা ফেলে দে। রোশনক তুই-ই আয় না। গুলবদন তো কোথায় পালিয়েছে, তার পাত্তা নেই। ওরে, ব্যথায় যে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে।'

হাঁক লাগাবার পরও যখন কেউই এল না তখন সে মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে চারিদিকে তাকায়। অন্ধকার দালানে ধুলিশয্যায় সে একা শুয়ে আছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকালে একটি সাদা কবরের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সেটি তার পিতার কবর।

এই দেখে সেই মহিলাটি চেঁচিয়ে ডাকে, 'আব্বুজান, আমি তোমার গুলবানু। দ্যাখো, আমি একেবারে একা। ওঠো, আমার জ্বর বাড়ছে। উঃ আমার পাঁজরায় বড় ব্যথা। ঠাণ্ডা লাগছে। আমার কাছে এই ছেঁড়া কম্বল ছাড়া গায়ে দেবার আর কিছুই নেই। মা আমায় ছেড়ে গেছে। মহল থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে। আব্বু, আমাকে তোমার কবরে ডেকে নাও। ভয় করছে আমার, কবর থেকে মুখ বের করে আমাকে একটু দেখো। পরশু থেকে কিচ্ছু খাইনি আমি। আমার গায়ে বিধছে নুড়ি ও কাঁকর। ইটের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছি আমি। কোথায় গেল আমার পালঙ? কোথায় গেল আমার দোশালা? বিছানা কোথায় আমার? আব্বু আব্বু, ওঠো, কতক্ষণ আর ঘুমোবে তুমি? উঃ কী ব্যথা, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমি।' এই বলতে বলতে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। দেখে সে মরে গেছে ও তার বাবা মির্জা দারা বখত তাকে কবরে নামাচ্ছেন এবং কেঁদে কেঁদে বলছেন, 'মা, এ হলো তোমার মাটির পালঙ।'

হুঁশ ফেরে। বেচারি বানু গোড়ালি ঘষতে শুরু করে। মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে, সে বলছে, 'এবার আমি মরছি। কে আমার মুখে ফোঁটা ফোঁটা শরবত গড়িয়ে দেবে? কে আমাকে আমার শেষ সময়ে সূরা ইয়াসীন পড়ে শোনাবে? কে নিজের কোলে আমার মাথা টেনে নেবে? আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমি একক। তোমার হাবীব আমার সাথী ও তত্ত্বাবধায়ক আর এই চেরাগে দেহলবী আমার প্রতিবেশী।

* * *

শাহজাদী মারা গেল এবং পরের দিন গরিবদের কবরখানায় তাকে সমাধিস্থ করা হলো এবং সেটাই তার অনন্তকালের পালঙ যার ওপর কেয়ামতের দিন পর্যন্ত সে ঘুমোবে।

শাহজাদী

বাড়িটার দেয়ালগুলো ছিল কাঁচা। যার একটা অংশ এই বর্ষাকালে পড়ে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে। দুয়ারে চটের পর্দা ঝুলছে। আমি ডাক দিলে একটি দাসী বাইরে আসে আর শাহজাদী সাহেবা আমাকে ভেতরে ডেকে নেন। বাড়িটার উঠোন খুব ছোট। অতি কষ্টে হয়তো দুটো চারপাইয়ের সংকুলান হয়। দালান তো এত ছোট যে দুটো চারপাই তাতে আটবে না। দালানের উত্তর দিকে একটি ছোট্ট কোঠাও আছে।

আমি যখন ভেতরে ঢুকলাম শাহজাদী সাহেবা চটের ওপর বসে হামান দিস্তায় তাঁর পান ছেঁচছিলেন। চটটা খুব পুরোনো ও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। তালিমারা একখানা সাদা চাদরও পাতা ছিল। ছোট্ট একটি বালিশ, একটু ময়লাও হয়েছে। শাহজাদীর সামনে মাটির একটি লোটা যাতে ছাই ভরা। শাহজাদী সেটাকে পিকদান হিসাবে ব্যবহার করেন। ডানদিকে পানের বাটা রাখা। বাটার কড়াই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার ওপর খয়েরের ছাপ নেই। দালানের কড়িকাঠ অনেক পুরোনো। তক্তাগুলো কাঠবেড়ালি ও ইঁদুররা ঝরঝরে করে দিয়েছে।

শাহজাদী সাহেবার মাথার চুল ধবধবে সাদা। চোখের পলক ও ভুরুও সাদা হয়ে গেছে। যৌবনে নিশ্চয়ই তাঁর লম্বা গড়ন ছিল তাই এখন বেশ নুয়ে গিয়েছেন। তাঁর কাপড়-চোপড় বেশ সাফ-সুতরো কিন্তু প্রত্যেক কাপড়ে জায়গায় জায়গায় তালি দেওয়া।

তাঁর কণ্ঠস্বর খুব পরিষ্কার এবং বেশ মিষ্টি; লোককে প্রভাবিত করে। কথাবার্তা বলেন খাঁটি উর্দু ভাষায়। খুবই গম্ভীরভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মুখের ওপর অসংখ্য বলিরেখা এবং শরীরও খুবই কাহিল।

তাঁর সামনে গিয়ে আমি সালাম করলে তিনি বলেন, 'বেঁচে থাকো। বুঝলে মিয়া, যখন থেকে চোখ খারাপ হয়েছে দরগাহ শরীফে হাজিরা দিতে পারিনি। তোমাকে কখনো দেখিনি কিন্তু অনেকদিন থেকে নাম শুনছি। যখন খাদেমা বুড়ি নাম নিয়ে বলল যে খাজা সাহেব এসেছেন, দেখা করতে চান, বড় খুশি হলাম যে এতদিন যার নাম শুনতাম সে নিজেই আজ আমার বাড়ি এসেছে। দরগাহে নিজামুদ্দীনের প্রতি আমার গুরুজনদের খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল আর আমি সর্বদা সালানা ওরসে যেতাম। এখন চোখ নেই, হাত-পাও চলে না! বলো, কী মনে করে এলে?'

আমি বলি, 'আসার কারণ এখুনি বলছি। কিন্তু প্রথমে বলুন, এ বাড়িতে আপনার কোনো কষ্ট হয় না তো? এটা তো খুবই ছোট বাড়ি এবং ছাদও জায়গায় জায়গায় ভাঙাচোরা। নিশ্চয়ই ঝুরঝুর করে মাটি পড়ে।'

তিনি বলেন, 'আরে মিয়া! তুমি তো এ বিষয়ে অন্তত ভাবলে। যখন ভাগ্যই কেড়ে নিল কেল্লা ও রাজমহল তখন যা পাওয়া গেছে তা-ই ভালো। মাসে দেড় টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ি আর কোথায় পাব? ছাদ থেকে এমনই মাটি ঝরে যে একটি রাতও এমন যায় না যাতে অন্তত দু-চার বার বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে না হয়। এক সময় ছিল যখন লালকেল্লার ভেতর নিজের মহলে ঘুমোতাম। ছাদে পাখি বাসা বেঁধেছিল। তার কিছু খড়-কুটো বিছানায় এসে পড়ায় সারারাত ঘুমই এল না। আর এও এক সময়— রাতভর মাটি ঝরে আর তা সহ্য করতে হয়।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'সরকার থেকে কিছু পেনশন পান?' জবাবে বলেন, 'হ্যাঁ, মাসে দশ টাকা অনেক দিন থেকে পাচ্ছি।' আমি বলি, 'আর কোনো আয় আছে?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ, একটা বাড়ি আছে যার ভাড়া পাই সাত টাকা। আগে আমি ওই বাড়িতেই থাকতাম। কিন্তু যখন থেকে চোখ হারালাম তখন থেকে মাসে দশ টাকায় কুলোয় না। তাই সে বাড়িটা ভাড়ায় দিয়েছি এবং নিজে কম ভাড়ায় বাড়িতে চলে এসেছি। বুড়ি খাদেমা আর আমি। বাড়ি ভাড়া ও আমাদের খাওয়া-পরার খরচ ছাড়া আবার পান-সুপারি ও লোক লৌকিকতাও ওই সতেরো টাকায় সারতে হয়।' আমি বলি, 'আমার ইচ্ছা

আপনি আপনার অবস্থা আমাকে জানান। আমি আমার বইয়ে তা লিখি। কেননা, আপনার বংশের অনেকের বিষয়ে আমি লিখেছি।'

এ কথা শোনামাত্র শাহজাদী সাহেবা পান ছেঁচা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, 'না মিয়া, এ আমি চাই না যে আমার নাম বাড়িতে বাড়িতে গলিতে গলিতে ঘুরুক।' আমি বলি, 'আপনার নাম লিখব না। শুধু হালচালের বিষয়ে লিখব।' তিনি জবাব দিলেন, 'আবার হালচাল। শুধু দু-কথা—'বাদশা ছিলাম, ফকির হয়েছি। এর চেয়ে বেশি যদি জানতে চাও, তাহলে বলব—এরপরে আমরা মরেও যাব।'

আমি বলি, 'আপনি আপনার হালচাল বলুন। আমি নাম-ঠিকানা লিখব না।' শাহজাদী সাহেবা এত রেগে গিয়েছিলেন যে অনেকক্ষণ থ মেরে বসে রইলেন, তারপর পানের বাটা নিজের কাছে টেনে আমার জন্য একটা খিলি সাজালেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মিয়া, সিপাহী বিদ্রোহের সময় আমার বয়স ছিল দশ-বারো বছর। আমরা কেল্লার ভেতর থাকতাম। বাদশাহ সালামত আমাদের খানদানের ওপর একটু ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু আমাদের ভাতা প্রতিমাসে আমরা পেতাম। তিন ভাই ছিল আমার, বোনের মধ্যে আমি। বাবা শেষ বয়সে একটা বিয়ে করেছিলেন। যদিও আমার মা তখনো বেঁচে। বুড়ো বয়সে এই বিয়ের জন্য মা ও তাঁর সতীনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত এবং আমরাও ভাই-বোন মিলে সৎমার সঙ্গে ঝগড়া করতাম। কিন্তু সৎমা আমাকে খুব ভালোবাসতেন আর আমাকে মা ও সৎমা দুজনেরই আদুরে মেয়ে বলা হতো। খিদমত করার জন্য আমাদের বাড়িতে কয়েকজন পুরুষ ও মেয়ে চাকর ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ছয় মাস আগে সৎমার কলেরা হলো। তিনি মারা গেলেন। আমার দুই ভাইও সে সময় কলেরায় মারা যায়। আর সিপাহী বিদ্রোহের সময় আমরা শুধু দুই ভাই-বোন, বাবা ও মা ছিলেন।

বাদশাহ সালামত কেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মাকবারায় (সমাধি সৌধ) চলে গেলেন। আরও কত কেল্লাবাসীই কেল্লা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। কেল্লা হয়ে গেল খালি। কিন্তু আমাদের বাড়ি কেল্লা থেকে একটু আলাদা ছিল আর খুব মজবুত। এই জন্য আব্বাজান যেতে রাজি হলেন না, বললেন,

'বাইরে গেলেও মারা পড়ব আর বাইরে মরা হবে আরও খারাপ। সুতরাং এখানে বাড়িতেই থাকি। খোদার যা মর্জি এই বাড়িতেই হবে।'

বাদশাহ সালামতের যাওয়ার পর দুদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কেউ এল না। সদরের কাজের চাকর ও অন্দরের বাঁদিরা সবাই পালিয়েছে। আমরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। দেউড়িতে তিন-চারটে দরজা ছিল। খুব ভারী ভারী পাল্লা তার। খুব মোটা মোটা আংটা ও শেকল লাগানো ছিল তাতে। তিন দিনের দিন বাড়ির বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ ও অনেক লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল। কারা যেন দরজা ভাঙতে শুরু করল। আমার ভাইয়ের বয়স ছিল ষোলো। আব্বাজান ও আম্মা তখুনি ওযু করলেন। আর ভাইকে বললেন, 'মিয়া ওঠো, তুমিও ওযু করো। মরার সময় এসে গেছে।' এ কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল আর আমি গিয়ে আম্মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন, আমাকে আদর করলেন। বললেন, 'ভয় পেয়ো না। আল্লাহ সবাইকে মদদ করেন। হয়তো তিনি বাঁচবার কোনো উপায় বের করে দেবেন।' এরপর সবাই মিলে ওযু করে, মুসল্লা পেতে সিজদায় মাথা নুইয়ে আল্লাহ তাআলার রহমত চাইতে থাকি। দরজা ভাঙার আওয়াজ ক্রমাগত কানে আসছিল। আমরা সবাই সিজদার অবস্থাতেই ছিলাম যখন দশ-বারোজন ইংরেজ ও সমানসংখ্যক শিখ সঙ্গী চড়ানো বন্দুক নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল। আব্বা ও ভাইজান তখুনি সিজদা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। আব্বা আমাকে কোলে নিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে দিলেন। একজন শিখ আব্বাজানকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে এবং এখানে কেন বসে রয়েছে?' আব্বা জবাব দিলেন, 'এ আমার বাড়ি, আমি এখানে থাকি। শাহ আলম বাদশাহর সন্তান আমি।' সেই শিখটি ইংরেজ অফিসারকে এই কথা বোঝাল। ইংরেজ অফিসার ভাঙাচোরা উর্দুতে কিছু বলে যা আমি বুঝতে পারি না। তারপর শিখটি আব্বাকে বলল, 'সাহেব বলছেন যে বাদশা পালিয়ে গেছেন। অন্য সবাই পালিয়েছে। তুমি কেন পালাওনি?' আব্বা বললেন, 'বাদশাহ আমার ওপর একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেইজন্য তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি আর আমিও তাঁর সঙ্গে যাইনি। তা ছাড়া আমরা সিপাহী বিদ্রোহে শরীক হইনি। এও আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস যে ইংরেজ সরকার নির্দোষদের কষ্ট

দেয় না। আমরা নির্দোষ। এইজন্য আমরা পালাইনি।' ইংরেজ অফিসার বলল, 'তোমাকে টিলায় যেতে হবে। আমরা খোঁজ-খবর নেব। যদি তুমি নির্দোষ হও তো তোমার কোনো ভয় নেই।' আব্বা বলেলন, 'আমার সঙ্গে আমার বিবি ও একটি ছোট মেয়ে আছে। এখানে কোনো গাড়িঘোড়া নেই আর মেয়েরা পায়ে হেঁটে অভ্যস্ত নয়।' ইংরেজ অফিসার জবাব দিল, 'এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারব না। যদি তোমরা এখানেই থেকে যাও অন্য সেপাইরা এখানে আসবে এবং তোমাদের মেরে ফেলবে। তাই তোমার উচিত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া। দুজন সেপাই তোমাদের সঙ্গে দেব আমরা। যদি পথে কোনো যানবাহন পাওয়া যায় তাহলে তোমার স্ত্রী ও মেয়ে তাতে বসে যাবে নইলে এদের হেঁটেই যেতে হবে।'

অগত্যা আব্বাজন যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু বহুমূল্য অলংকার ও মণিরত্ন সঙ্গে নিলেন, বাকি সমস্ত জিনিসপত্র বাড়িতে ফেলে রেখে সেপাইদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। আম্মাজান সব সময় অসুস্থ থাকতেন। ভাইজান আমাকে কোলে তুলে নেয়। আব্বা আম্মাজানের হাত ধরেন আর আমরা আমাদের বাড়ির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাই—যে বাড়িতে আর কখনো ফিরে আসব না। আর হলোও তা-ই, আর কখনো সেখানে আমরা ফিরে যাইনি।

যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হই, সেই ইংরেজ ও শিখ ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে চলে গেল আর দুজন শিখ ঘোড়সওয়ারকে আমাদের সঙ্গে টিলার দিকে পাঠিয়ে দিল। তারা ঘোড়া ছুটিয়ে অন্য কোনো দিকে চলে গেল। কেল্লার দরজা পর্যন্ত এই সওয়াররা আস্তে আস্তে চলতে থাকে এবং আব্বা ও আম্মাকে তারা কিছু বলে না। আম্মা চলতে পারছিলেন না, কয়েক পা গিয়েই বসে পড়ছিলেন আর তাঁর শরীর কাঁপছিল। যখন তিনি বসে পড়তেন সওয়াররাও থেকে যেত। কিন্তু যখন আমরা কেল্লার বাইরে পৌঁছে গেলাম সওয়াররা জবরদস্তি শুরু করল। বলল, 'এমন করলে তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চলতে পার না?' আব্বাজান বেশ নরমভাবে জবাব দিলেন, 'ভাই তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে সঙ্গে একটি অসুস্থ ও দুর্বল নারী, জীবনে যে কখনো পায়ে হাঁটেনি। আমরা কোনো ছলনা করছি না। বিবি ও বাচ্চার জন্যই আমরা নাচার।' সওয়াররা এ শুনে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু আমার ভাইজানের মুখ থেকে

আচমকা বেরিয়ে এল, 'তোমরা তো আমাদের দেশের লোক, তোমাদের কি দয়া-মায়া নেই?' এ কথা শুনে একজন শিখ বলে, 'আমরা কি করি, হাকিমের হুকুম।' ভাইজান বলে, 'হাকিম এ তো বলেনি যে আমাদের ওপর জুলুম জবরদস্তি করো।' শিখ সওয়ার বলে, 'কী জবরদস্তি করেছি আমরা? কিন্তু এবার একটু জবরদস্তি করতে হবে। কেননা, তোমরা ইচ্ছে করে যেতে দেরি করছ।' এই বলে একজন সওয়ার আমাদের পেছনে চলল ও অন্যজন সামনে রইল। মা পেছনে ঘোড়া দেখে ঘাবড়ে গেলেন। হঠাৎ তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি এলিয়ে পড়লেন ও হায় হায় শব্দ করতে লাগলেন। শিখ সওয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই অবস্থা দেখে আব্বাকে বলে, 'আমি হেঁটে যাচ্ছি, তুমি এই অসুস্থ বিবিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাও।' শেষে আব্বাজান আম্মাকে কোলে তুলে ঘোড়ায় চেপে চললেন। আর সেই বেচারা শিখ সওয়ার টিলা পর্যন্ত হেঁটে গেল। টিলার ওপর ইংরেজ সৈন্য চারিদিকে তাঁবু ফেলেছে। আমাদেরও এক দিকের তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হলো। সেই শিখ সওয়াররা লঙ্গরখানা থেকে আমাদের রুটি এনে দিল। সে রাত আমরা ওই তাঁবুতেই কাটালাম।

পরদিন সকালবেলা ফৌজের বড় অফিসার আমাদের সকলকে তার সামনে ডেকে পাঠাল। দিল্লির একজন গোয়েন্দা সেই ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। অফিসার জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এদের চেন?' ও বলে, 'হ্যাঁ আমি চিনি। এরা বাদশাহর বংশের। লাল-কেল্লায় ইংরেজ নারী, পুরুষ ও বাচ্চাদের যে খুন করানো হয় তাতে এই লোকটার বিশেষ হাত ছিল।' এই শুনে অফিসার আব্বাজানের দিকে রাগী চোখে তাকায়। আব্বাজান জবাব দিলেন, 'এ লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। এ আগে আমার চাকর ছিল। চুরি করেছিল বলে একে আমি বের করে দিই। তাই শত্রুতা করে এ ধরনের কথা বলছে। আপনি ওকে শুধু এই জিজ্ঞেস করুন যে বাদশা বাহাদুরশাহ কতদিন থেকে আমার ওপর অসন্তুষ্ট এবং সালাম-দুআ কতদিন থেকে বন্ধ।' গোয়েন্দা জবাব দিল, 'এ কথা ঠিক যে আমি এর চাকর ছিলাম কিন্তু এটা ভুল যে চুরি করার দরুন ইনি আমায় বিদায় করেন। আমি নিজেই চাকরি ছেড়ে দিই। কেননা, উনি মাইনে খুব কম দিতেন। আর এও ঠিক যে বাদশাহ এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বাদশাকে খুশি করার জন্য তাঁর কাছে

ইনি যাওয়া-আসা শুরু করেন এবং যেদিন ইংরেজদের হত্যা করা হয় সেদিন যারা ইংরেজ মেয়ে ও শিশুদের হত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের ওপর ইনি রাগ দেখাচ্ছিলেন এবং ওর ছেলেও ওর স্বপক্ষে ছিল।' শোনামাত্রই অফিসার রেগে লাল হয়ে গেলেন এবং আব্বাজানের কোনো কথাই শুনতে চাইলেন না। যদিও তিনি ক্রমাগত বলতে থাকেন যে 'এ নিছক মিথ্যে কথা।' কিন্তু অফিসারের চোখ তখন রাগে লাল। কোনো কথা না শুনে সে হুকুম দিল, 'এখুনি এই দুজনকে গুলি মেরে উড়িয়ে দাও।' তারপর বলল, 'এ দুজন আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করিয়েছে কিন্তু আমরা এর ওপর দয়া করছি। এর বিবি ও বাচ্চাকে ছেড়ে দিচ্ছি। এদের দুজনকে ছাউনি থেকে বের করে দাও। যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যাক।'

গোরা ও দেশি সেপাইরা এগিয়ে এসে আব্বা ও ভাইজানের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। আব্বাজান আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন কিন্তু ভাইজান চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আম্মাজান খুব জোরে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আব্বাকে জড়িয়ে ধরতে আমি ছুটে গেলাম কিন্তু একজন সেপাই আমাকে জোরে ধাক্কা দিল, আমি আম্মার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। দেখলাম আব্বা ও ভাইজানকে সেপাইরা টানতে টানতে দূরে নিয়ে গেল। তাঁদের সামনে পাঁচ-ছয়জন সেপাই বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল। তাদের কাছে অফিসারও দাঁড়ায়। উঁচু আওয়াজে তিনি কিছু বলেন যা আমি বুঝতে পারিনি। এরপর সেপাইদের ইশারা করতে তারা বুকের ওপর বন্দুক রাখে আর বন্দুকের মুখ আব্বা ও ভাইজানের দিকে তাক করে। সেই সময় আব্বাজানের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তিনি একবার আমার নাম নিয়ে ডাকলেন, বললেন, 'শোনো মা, আল্লাহই ভরসা। আমরা দুনিয়া ছেড়ে চললাম।' তারপরে ভাইজানের গলা শোনা গেল, 'আম্মি, আম্মিজান, আপনার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আমি সইতে পারব না। সালাম, আম্মিজান, বিদায়!'

বন্দুকের শব্দ এল আর রাশি রাশি ধোঁয়া। দেখলাম আব্বা ও ভাইজান মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। কাঁদছিলাম আমি। বুক ভয়ের চোটে ফেটে যাচ্ছিল। আম্মার যখন একটু হুঁশ হলো বললাম, 'ওরা আব্বা ও ভাইজানকে মেরে ফেলেছে দেখুন। ওরা এখনো মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন। মাগো, ওদের

বুক থেকে এখনো রক্ত বেরুচ্ছে। ওরা আমাদের ছেড়ে গেল। ওদের সঙ্গে আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। আব্বাজান আমাকে ডাক দিয়েছিলেন আর ভাইজান আপনাকে। এবার কী হবে? এরা কি আমাদেরও মেরে ফেলবে? এরা কি আমাদের বন্দী করে রাখবে?' আম্মিজান দুহাতে ভর দিয়ে উঠলেন। আব্বা ও ভাইজানের মৃতদেহ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। আম্মাজানের ছটফটানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তিনি শিথিলভাবে বললেন, 'আমার খোকন, আমার সোনা, আমার বুকের মানিক, আমার জীবনের শেষ ভরসা, আমার স্বামী আমায় ছেড়ে গেলেন, আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। এই দুনিয়ায় আমার বলতে আর কেউ রইল না। ইয়া আল্লাহ, আমি দুনিয়াতে এসেছিলাম এ কী স্বপ্ন, না সত্যি। মাথার মুকুটই আমার মাটিতে মিশে গেল, জোয়ান ছেলের সঙ্গে রক্তাক্ত পড়ে আছেন তিনি। গোয়েন্দা, তোকে যেন আল্লাহ ধ্বংস করেন। তুই এমন মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে বললি। এরা দুজন সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরই হয়নি। আরে তুই কবেকার শোধ তুললিরে পাষণ্ড। আমার মতো রোগী দুখিনীর ওপরও তোর দয়া হলো না। এই সাদাসিধে ছোট্ট বালিকাটির কথাও তোর মনে হলো না। বিনা দোষে তুই আমার স্বামী ও পুত্রকে রক্তে ডুবিয়ে দিলি।'

আম্মা যখন এইসব বলছিলেন দেশি বাহিনীর সেপাইরা এল। আমার ও আম্মাজানের হাত ধরে উঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আমরা মৃতদেহের পাশ দিয়ে গেলাম। গুলি তাদের মাথায় ও বুকে লেগেছিল। রক্তে অনেক কিছুই চাপা পড়ে গিয়েছিল আর লাশ দুটি নিস্পন্দ পড়েছিল। সেপাই আমাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আম্মা চলতে পারছিলেন না, আমিও না। কিন্তু তারা আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। টিলার ওপর পাথরে আমাদের পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। বলতে পারব না, যে কষ্টে আমরা সে দিন পড়েছিলাম দুনিয়াতে আর কেউ কি সে রকম কষ্টে পড়েছে কি না।

সৈন্যদের ছাউনি থেকে বাইরে এনে সেপাইরা আমাদের ছেড়ে দিল। আম্মাজান একেবারে বেহুঁশ পড়েছিলেন আর আমি তাঁর পাশে বসে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন ঘেসেড়া ঘাসের বোঝা নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে এসে মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে মাকে দেখে বলে ওঠে,

'আরে ও মেয়েমানুষটা তো মারা গেছে।' সে ছিল হিন্দু। আমাকে ওখানে ছেড়ে সে ছাউনিতে গেল আর সেখান থেকে দু-তিন জন মুসলমান ঘেসেড়েকে ডেকে নিয়ে এল। তারাও বলল, 'এ মেয়েলোকটি তো মারা গেছে।' তারা আম্মা ও আমার হাতের এবং গলার গয়না খুলে নিয়ে বলল, 'বহুলোক মারা গেছে অনেক গয়নাপাতি পাওয়া গেছে কিন্তু সবই গেছে সরকারি খাজাঞ্চিখানায়। এতে কিন্তু আমাদের দাবি।' তারপর তারা একটি গর্ত খুঁড়ে মাকে মাটি চাপা দিয়ে গেল। একা বসে বসে কাঁদছিলাম। খানম বাজার থেকে একজন মুসলমান স্বর্ণকার বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কুতুব সাহেব যাচ্ছিল। সে আমার কাছে এল। তারা আমাকে সঙ্গে করে কুতুব সাহেব নিয়ে গেল। যখন শহরে শান্তি ফিরে এল সেই মুসলমান স্বর্ণকারও দিল্লি ফিরে এল এবং আমার আত্মীয় যে কয়েকজন শাহজাদা বেঁচে-বর্তে ছিলেন তাদের হাতে আমাকে সঁপে দিল। তাদের কাছে থেকে আমি বড় হলাম। তাদেরই মধ্যে আমার বিয়ে হলো এবং বিয়ের পর পেনশন পেতে শুরু করলাম। খোদা আমাকে কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছিলেন কিন্তু কেউ বাঁচল না। এমনকি স্বামীও মারা গেল। এখন বছর চারেক হতে চলল চোখও হারিয়ে ফেলেছি।'

'শুনলে বাবা দুখিনীর এই কাহিনি। আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হাহাকার ডুকরে ওঠে। এই দুনিয়াতে কেবল দশ বছর পর্যন্ত আমি আরামের মুখ দেখেছি। আর সত্তর বছর ধরে শুধু কষ্ট ভোগ করছি। এখন কবরে পা দিয়ে বসে আছি। আজ মরলেই কাল দ্বিতীয় দিন। ভাগ্যিস বেচারি বুড়ি আয়াকে পেয়ে গেছি। বাজার থেকে দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে আসে আর দিন-রাত কাছে বসে থাকে। আমরা দুজনে শেষ বয়সের দিনগুলো মিলেমিশে কোনো রকমে কাটাচ্ছি।'

নারগিস নযর

শাহজাদী নারগিস নযর ছিল বাহাদুরশাহ্র ছেলে মির্জা শাহরুখের মেয়ে। ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহের সময় তার বয়স ছিল সতেরো।

দিল্লির লাল কেল্লায় দেওয়ানে খাস ও মোতি মসজিদের পশ্চিমে গোরা ব্যারাকের পুবদিকে পাথরের পুকুর আছে একটা, যার মাঝখানে তৈরি করা হয়েছিল একটি সুন্দর মহল। তার উত্তর দিক থেকে একটা খাল বয়ে আসত। ছিল শ্বেতপাথরের ঝিলমিলি ও চেরাগদান। তার ওপর দিয়ে খালের পানি বয়ে এসে পড়ত এই পুকুরে। মির্জা শাহরুখ বাহাদুর থাকতেন এই মহলে। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিল। এই জন্য মির্জা সাহেব নিজের মেয়ে নারগিস নযরকে খুব ভালোবাসতেন।

জল মহলকে কাশ্মীর শাল, তুরুক দেশের গালিচা আর বেনারসি কাপড় দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল। নারগিস নযরের খুব শখ ছিল মহলটাকে সাজিয়ে রাখার। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বড়ই সুদক্ষ। পুরো কেল্লার সমস্ত মহল ও হাবেলির মধ্যে তাঁর মহলটিকে সবচেয়ে সুন্দর ও সাজানো-গোছানো গণ্য করা হতো।

নারগিস নযর সকালবেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উঠতেন। গরমকালে তাঁর পালঙ আঙিনায় পাতা হতো। শ্বেতপাথরের মেঝে। পালঙের পায়া ও ছতরি ছিল সোনার উপরে মণিমুক্তার কাজ করা। রেশমি কাপড়ের সুন্দর মশারি। ভেতরে রাখা থাকত রেশমি বালিশ। শিয়রে থাকত চারটে নরম তুলতুলে বালিশ। শিয়রের বালিশগুলোর পাশেই থাকত দুটো ছোট ছোট গোলগাল বালিশ যাকে গাল-তাকিয়া বলা হতো। এই বালিশগুলো ছিল গালের ঠেস দেওয়ার জন্য, যদি শাহজাদীর মাথা বালিশ থেকে নেমে যায় তাহলে তার

গালকে কষ্ট পাওয়া থেকে বাঁচায় গাল-তাকিয়া। দুটো বড় বড় পাশ-বালিশ দুপাশে যাতে শাহজাদী সাহেবা হাঁটু দুটো আয়েশে রাখতে পারেন। রাতে যখন নারগিস নযর মশারির মধ্যে ঢুকতেন তখন বকুল, জুঁই ও চাঁপা ফুল তার গাল-তাকিয়ার কাছে রাখা হতো যাতে রাতভর তার সৌরভ শাহজাদীকে মাতিয়ে রাখে। যে মুহূর্তে নারগিস নযর মশারির মধ্যে ঢুকতেন চারটে নাচন মেয়ে এসে হাজির হতো সেখানে আর তারা খুব মৃদু স্বরে গান গাইত যতক্ষণ না শাহজাদী ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে এই নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরা পালঙের পাশে এসে গান গাইত আর তার সুরেলা আওয়াজে শাহজাদী সাহেবা জেগে উঠতেন।

ওঠবার পরেও শাহজাদী মশারির মধ্যে বসে হাই তুলতেন, আড়মোড়া ভাঙতেন আর মেয়েগুলো তার সঙ্গে হাসি-তামাশার কথা বলত। কেউ বলত, 'ও হুজুর, আপনার হাই পাচ্ছে, দাঁড়ান রুমাল ধরি। মুখটা ঢেকে নিন।' অন্যটি বলত, 'মহারানি, আপনার আড়মোড়া ভাঙা দেখবার জন্য পুকুরের মাছগুলো পানির ওপর উঠে আসছে।' নারগিস নযর চোখ কচলে হেসে বলে, 'যা পালা, প্রত্যেক বার পাজিটা কেমন মিছে কথা শোনায়।' ছুকরি জবাব দেয়, 'আমি মিছে কথা বলছি কি সত্যি, আয়নাকে জিজ্ঞেস করুন না। সেও তো সামনে থেকে আপনাকে দেখছে। ওর মধ্যেও তো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেও মেহেদী লাগানো লাল লাল আঙুল উঁচুতে উঠিয়ে হুজুরের আড়মোড়া ভাঙার তারিফ করছে। ওখানেও দেখুন ও কেমন মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে।'

তৃতীয় জন বলে, 'লাল লাল মেঘের মাঝখানে থেকে সূর্যের কিরণগুলো এমনভাবে বেরিয়ে আসছে যেন আপনার লাল লাল ঠোঁটের মাঝখানে থেকে ঝকঝকে সাদা দাঁত আর আপনার গাল দুটো যেন ঊষার আভা। চুল ছড়িয়ে মুখের ওপর এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন চতুর্দশীর চাঁদের ওপর মেঘ ঘিরে এসেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার কাছে হার মেনে তার বুক ফেটে গেছে এবং চাঁদের চারদিকে তার হৃদয়ের টুকরাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে।'

এই সমস্ত কথা শুনে স্মিতমুখে নারগিস নযর মশারি থেকে বেরিয়ে আসেন। চৌকির ওপর এসে বসেন। তারপর বাইরে গিয়ে খইল ও বেসম

দিয়ে মুখ-হাত ধোন। পোশাক বদলান, প্রাতরাশও হয়ে যায়। এরপর নিজেই গিয়ে বাড়ির সাজসজ্জা দেখতেন ও নিত্যনতুন আসবাবপত্র সাজানোর ধরন ধারণ আবিষ্কার করতেন। দুপুরের খাওয়ার পর গান হতো, সন্ধ্যায় ফুলবাগানে পায়চারির রেওয়াজ পুরা করা হতো। রাত্রিভোজনের বাহারই ছিল আলাদা। বাজনা বাজছে, গান গাওয়া হচ্ছে এবং সখিদের সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া চলছে।

যে রাতে বাদশা বাহাদুরশাহ লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মাকবারায় গেলেন, সকলের আশঙ্কা দৃঢ় হলো যে সকালবেলা পর্যন্ত ইংরেজ দিল্লি জয় করে নেবে। নারগিস নযর নীরবে জল মহলের একধারে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো দেখছিলেন। তাঁর ছায়া পড়ছিল পানিতে এবং পানিতে নিজের ছায়া দেখে অদ্ভুত রকমের এক নেশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

হঠাৎ তাঁর বাবা মির্জা শাহরুখ ভেতরে এলেন, 'বললেন, নারগিস মামণি, আমি আব্বা হুজুরের (বাহাদুরশাহ) সঙ্গে যেতে চাই। তুমি এখুনি যাবে কি? তোমার জন্য যানবাহনের বন্দোবস্ত করি। সকালবেলায় তুমি এসো।' নারগিস নযর বলল, 'বাবা, আপনি এখনই যাবেন না। শেষরাতে আমার সঙ্গে চলবেন। দাদাজানের সঙ্গে যাওয়া আমি উচিত মনে করি না। ইংরেজ সৈন্য তাঁকে খুঁজবে এবং যারা তাঁর সঙ্গে থাকবে তাদের সবাইকে অপরাধী গণ্য করা হবে। এই জন্য তাঁর সঙ্গে হুমায়ুনের মাকবারায় যাওয়া ঠিক হবে না। গাজীনগর চলুন, সেখানে আমার ধাইমার বাড়ি এবং শুনেছি খুবই নিরাপদ ও ভালো জায়গা সেটা। বেশ বদলে যাওয়া উচিত। যখনই আপদ-বালাই দূর হবে তখন এখানে ফিরে আসব।'

মির্জা বললেন, 'বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছে। গাজীনগর যাওয়ার জন্য গাড়ির বন্দোবস্ত করি। তোমার সঙ্গে কে কে যাবে?'

নরগিস নযর জবাব দিল, 'কেউ না। আমি একা যাব। কেননা, চাকর বাকর সঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না আর মনে হয় তারা যেতে রাজিও নয়।' এ কথা শুনে মির্জা বাইরে চলে গেলেন আর নারগিস নযর চাঁদের দিকে চোখ ফিরিয়ে ঝিলের পানিতে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে নারগিস নযর তাঁর চাকরানিদের ডাক দিলেন কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। জানতে পারা গেল সবাই পালিয়েছে এবং নারগিস নযর পুরো জলমহলে একা। প্রথম বারই এমনটি ঘটল যে নারগিস নযর হুকুমের স্বরে ডাক দিলেন কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ভয় পেয়ে নারগিস মহলের ভেতরে গেলেন। সমস্ত বাতি জ্বলছিল কিন্তু কোথাও কেউ ছিল না। ভেতরে থাকতে নারগিসের ভয় হলো, আবার তিনি বাইরে আঙিনায় বেরিয়ে এলেন। কেল্লার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ ভেসে আসছিল, মনে হচ্ছিল চারিদিকে লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে নারগিস নযর তাঁর বাবার পথ চেয়ে বসে রইলেন, কিন্তু তিনি এলেন না। উতলা হয়ে নারগিস কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাত দুটোর সময় একজন খোজা এসে বলল, 'সাহেবে আলম বলেছেন, ইংরেজের গোয়েন্দারা আমার খোঁজে কেল্লার ভেতরে ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তোমার সঙ্গে গাজীনগর যেতে পারব না। যানবাহনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তুমি খোজার সঙ্গে চলে যেয়ো আর আমি বেশভূষা পাল্টে কোথাও চলে যাচ্ছি।'

নারগিস নযর ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'কোথায় যাওয়া ঠিক করেছেন?' খোজা বলল, 'আমি জানি না।' নারগিস নযর হুকুমের সুরে বললেন, 'যা, গিয়ে জেনে আয়, আব্বা হুজুর কোথায় যাবেন? তিনি বেশ বদলে আমার সঙ্গে গাজীনগর কেন যাচ্ছেন না?'

খোজা তখুনি ফিরে যায় আর নারগিস নযর আঙিনায় পায়চারি করেন। কিছুক্ষণ পরে খোজা ফিরে এসে বলে, 'আপনার আব্বাজান সহিসের পোশাক পরে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছেন আর কেউ জানে না যে কোথায় গেছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঘোড়াগাড়ি প্রস্তুত।' কান্না পেয়ে গেল নারগিস নযরের। জীবনে এই প্রথমবার নিরুপায় অসহায় অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তিনি গয়নার বাক্স ও কিছু দরকারি কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিলেন যা খোজা নিজের হাতে উঠিয়ে নিল ও তিনি জলমহল থেকে বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে বসার আগে তিনি একবার পেছন ফিরে জলমহল ও তার সাজ-সজ্জার দিকে তাকালেন, বললেন, 'তোকে আবার দেখা ভাগ্যে আছে কি না কে জানে। হয়তো চিরদিনের জন্যই তোর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

রাত তিনটে বেজে গেছে। নারগিস নযর গাড়িতে বসে গাজীনগরের দিকে যাচ্ছেন। সকাল আটটায় সেখানে পৌঁছেও গেলেন। পথে অনেক লোকের আনাগোনা সত্ত্বেও কেউ তাঁর গাড়ি থামায়নি। গাজীনগরে নারগিস নযরের ধাইমার বাড়ি খুবই প্রসিদ্ধ। যে মুহূর্তে নারগিস নযর ধাইমার বাড়ির সামনে বাড়ি থেকে নামেন ধাইমা ছুটে আসে এবং দুহাত বাড়িয়ে শাহজাদীর আলাই-বালাই নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসায়। সাধ্যাতীত আদর-আপ্যায়ন করে।

দু-তিন দিন নারগিস নযর ধাইমার বাড়িতে দিব্যি আরামে কাটালেন। হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বাদশাহ ধরা পড়েছেন ও শাহজাদাদের হত্যা করা হয়েছে। সৈন্য গাজীয়াবাদ লুণ্ঠন করতে আসছে। ধাইমাকে বলে কয়ে নারগিস নযর গয়নার বাক্সটা মাটিতে পুঁতে ফেললেন আর বিপদের প্রতীক্ষায় থাকলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরে শিখ সেনা গাজীয়াবাদে প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের খুঁজতে শুরু করে দেয়। গুপ্তচররা বলে দেয় বাদশার নাতনি তার ধাইমার বাড়িতে আছে। দুজন শিখ সর্দার চারজন সেপাই নিয়ে ধাইমার বাড়িতে এসে ধাইমা ও তার বাড়ির সবাইকে গ্রেপ্তার করে নেয়। নারগিস নযর একটি কুঠরিতে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দরজা ভেঙে তাঁকেও বের করে বিনা পর্দায় সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সর্দার জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি বাহাদুরশাহর নাতনি?' নারগিস নযর বলেন, 'আমি একজন লোকের মেয়ে। বাদশাহর মেয়ে হলে এ গরীবের বাড়িতে কেন আসব? যদি খোদা আমাকে বাদশাহর নাতনি করতেন তাহলে তোমরা বিনা পর্দায় এভাবে দাঁড় করাতে না। তোমাদের লজ্জা করে না নিজের দেশের মেয়েদের ওপর জুলুম করতে?' সর্দার বলে, 'আমরা কোন জুলুমটা করলাম? আমরা শুধু জানতে চেয়েছি তুমি কে? আমরা শুনেছি যে তুমি বাহাদুরশাহর নাতনি আর তোমার আব্বা কেল্লার মধ্যে অনেক ইংরেজ মেয়ে ও শিশুদের হত্যা করেছে।' নারগিস নযর বলেন, 'যে করে সেই তার ফল পায়। যদি আমার বাবা এমন কাজ করে থাকেন তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা করো। আমি কোনো জুলুম করিনি। আমি কাউকে মারিনি।'

এই শুনে অন্য শিখ যুবক সর্দার বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, তুমি তো চাউনি দিয়েই কতল করছ। তলোয়ার বা হাতিয়ার দিয়ে মারবার দরকার কি তোমার।'

যদিও জীবনে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা এই প্রথম তবুও বেশ সাহসের সঙ্গে নারগিস নযর জবাব দেন, 'চুপ করো। বাদশাহ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে এরকম বেআদবের মতো কথা বলতে নেই। তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলা হবে।' যুবক সর্দার এ শুনে ভীষণ ক্ষেপে যায়, এগিয়ে এসে নারগিস নযরের চুলের গোছা ধরে টান দেয়। বুড়ো শিখ সর্দার যুবক সর্দারকে বাধা দিয়ে বলে, 'মেয়েদের সঙ্গে এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়।' এ শুনে যুবক সর্দার চুলের গোছা ছেড়ে দেয়। একটা ভাড়াটে গরুর গাড়ি আনিয়ে তাতে নারগিস নযরকে বসানো হয়। ধাইমা ও তার বাড়ির সবাই বন্দী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে। নারগিস নযরকে জিজ্ঞেস করা হয়, 'তোমার গয়না-গাঁটি, টাকা-পয়সা কোথায়?' তিনি বলেন, 'আমি নিজেই গয়না, আমিই মণিমুক্তো, আমিই ধনদৌলত। আমার কাছে আর কিছু নাই।'

এই শুনে দুই সর্দারই চুপ করে যায় আর গরু্র গাড়ি দিল্লির দিকে যাত্রা করে। হিণ্ডন নদীর কাছে গাঁয়ের জাঠ ও গুজররা শিখ সৈনিকদের ওপর বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে এবং অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলে। সংখ্যায় শিখরা ছিল কম ও গাঁয়ের লোক বেশি। তাই সমস্ত শিখ মারা পড়ে আর গাঁয়ের লোকেরা বন্দীদের সঙ্গে করে গাঁয়ে নিয়ে যায়। নারগিস নযরের গায়ে যে দু-চারটে গয়না ছিল তা এই গেঁয়ো লোকেরা খুলে নেয় আর দামি কাপড়-চোপড় সব কেড়ে নেয়। কোনো চামারনির ছেঁড়া ঘাঘরা-কুর্তা ও ময়লা দোপাট্টা শাহজাদীকে পরতে দেয়। কেঁদে কেঁদে নারগিস নযরের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল কিন্তু শরীর ঢাকবার জন্য এই কাপড়ই তিনি পড়তে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ পরে পাশের গাঁ থেকে কিছু মুসলমান গেঁয়ো লোক আসে। তাদের মোড়ল নারগিস নযরকে গুজরদের কাছ থেকে কিনে নিজের গাঁয়ে নিয়ে যায়। এরা ছিল জাতে রাঙ্গড় আর কিছু ছিল তগা জাতের মুসলমান। মোড়ল তার ছেলের পক্ষ থেকে খবর পাঠাল ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দেই। মোড়ল ছিল বুড়ো, তার ছেলে যদিও গেঁয়ো তবে দেখতে শুনতে বেশ ভালোই ছিল।

নারগিস নযর হ্যাঁ করাতে কাজী তাদের বিয়ে পড়ালেন। নারগিস নযর তিন চার মাস মোড়লের বাড়িতে নতুন বউ হয়ে বেশ আরামেই দিন কাটালেন। ইংরেজদের দখল পুরোপুরি কায়েম হয়ে গেছে আর তাদের গোয়েন্দা জায়গায় জায়গায় ঘুরে খবরাখবর জোগাড় করছে। একজন গোয়েন্দা দিল্লির হাকিমকে খবর দিল যে মির্জা বাগী (বিদ্রোহী)কে তো পাওয়া গেল না কিন্তু তার মেয়ে অমুক গাঁয়ে অমুক মোড়লের বাড়িতে আছে। ইংরেজ হাকিমের হুকুমে ওই গাঁয়ে পুলিশ গেল। মীরাটের পুলিশ এসে গাঁ ঘিরে ফেলল। নারগিস নযর, তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে ধরে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হলো। হাকিম নারগিস নযরকে মির্জার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন কিন্তু যখন কোনো দরকারি খবর পেলেন না তখন হুকুম দিলেন, মনে হচ্ছে মোড়ল ও তার ছেলে বিদ্রোহী আর এরা দুজন বিদ্রোহীর মেয়েকে ঠাঁইও দিয়েছে সুতরাং এদের দুজনকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে এই মেয়েটিকে দিল্লির কোনো মুসলমানের হাতে সঁপে দেওয়া হোক। এই ভাবে মোড়ল ও তার ছেলেকে দশ-দশ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। নারগিস নযরকে জিজ্ঞেসা করা হলো, 'তিনি কার কাছে থাকতে চান?' শাহজাদী জবাব দেন, 'যদি আমাদের বংশের কেউ দিল্লিতে থাকে তাহলে তার কাছে যেন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।' জানা গেল তৈমুর বংশের কেউ ফেরেনি। অতএব নারগিস নযরকে একজন মুসলমান সেপাইয়ের হাতে সঁপে দেয়া হলো। সে তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সেপাইটার বাড়িতে বউ বর্তমান, যখন সে দেখল যে সেপাই একটা পরম সুন্দরী যুবতী নিয়ে এসেছে, নারগিস নযরকে ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

এই প্রথমবার জীবনে কেউ নারগিস নযরকে ধাক্কা মারল। সেপাই নারগিস নযরকে নিয়ে তার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়িতে গেল। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ বয়সের মুসলমান ও বাড়িতে একা থাকতেন। শাহজাদীর অবস্থার কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং খুব আদর করে তাঁকে বাড়িতে ঠাঁই দিলেন। এক রাত্রি নারগিস নযর এ বাড়িতে স্বস্তিতে কাটালেন।

দ্বিতীয় রাত্রিতে নারগিস নযর যখন ঘুমোচ্ছিলেন কিছু লোক হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল। নারগিস নযর খুব হাত-পা ছুঁড়লেন কিন্তু

তারা এত জোরে চেপে ধরেছিল যে বেচারা একটুও নড়তে চড়তে পারলেন না। এই লোকগুলো ছিল সেই গাঁয়ের যেখানকার মোড়লের ছেলের সঙ্গে নারগিস নযরের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তারা তাকে দিল্লির কাছের একটি গাঁয়ে নিয়ে একটি কুঁড়েঘরে নামাল আর শোবার জন্য একটা চারপাই দিল। তগা মুসলমানদেরই গাঁ ছিল এটা।

নারগিস যে বাড়িতে থাকতেন সেটা মোড়লেরই বাড়ি। তিন-চার বছর নারগিস নযর এই বাড়িতেই কাটালেন। ঘরকন্নার সব কাজই তিনি করতেন যদিও শিখতে পারলেন না গোবর ঘাঁটা ও দুধ দোয়া।

চার বছর পরে তার স্বামী জেল থেকে মুক্তি পেল। মেয়াদ পুরো হওয়ার আগেই সরকার তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। সে নারগিস নযরকে এ-গাঁ থেকে নিজের গাঁয়ে নিয়ে গেল। সেখানেই তিনি সারাজীবন কাটিয়ে দেন। কয়েকটি বাচ্চা হয়েছিল তার। ১৯১১ সালে শাহজাদী নারগিস নযর মারা যান।

নারগিস নযর বলতেন, 'যখন আমি দিল্লির কাছে তগা মোড়লের বাড়িতে থাকতাম তখনকার কথা বলছি। বর্ষাকালে মেঘ ডাকছে, বিজলি চমকাচ্ছে আর আমি আমার চালাঘরে মোটা খদ্দরের একটি চাদর মুড়ি দিয়ে খসখসে চারপাইয়ের ওপর শুয়ে স্বপ্নে দেখলাম, মহলের মণিমুক্তাজড়িত সোনার পালঙে শুয়ে আছি। জুঁই, চাঁপা ও বকুল ফুল আর রেশমি বালিশগুলো আমার কাছে। গায়িকা মেয়েগুলো গান গাইছে মৃদুস্বরে আর আমি উপভোগ করছি এক অনির্বচনীয় পুলক। এই স্বপ্নাবস্থাতেই একজন গায়িকাকে হুকুম দিই, মশারি ওঠা আর আমাকে তুলে বাসিয়ে দে। দেখলাম, সে ছুটে এল, আমাকে কোলে করে ওঠাল আর বাড়াবাড়ি করে আমার গা একটু টিপে দিল। আমি তাকে এক চড় মারি, সে জোরে হেসে ওঠাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ভীষণ অন্ধকার। এই স্বপ্ন ও জলমহলের স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে কুঁড়েঘরের দরজায় এসে দাঁড়াই। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল, বিদ্যুৎ চমকালে উঠোনে জমা পানি দেখা যাচ্ছিল আর আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি জলমহলের আঙিনায় দাঁড়িয়ে চাঁদ ও হাউজের পানিতে তার ছায়ার খেলা দেখছি।'

‘যবে থেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েছি আমি একটুও উদ্বিগ্ন বোধ করিনি বা কখনো ভালো দিনগুলোর কথা মনে করিনি। কিন্তু জানি না আজ কী ব্যাপারে বারে বারে জলমহল মনে পড়ছে আর এও মনে আসছে যে আমি ভারত সম্রাটের নাতনি আর বাবার আদুরে মেয়ে। আর এও মনে পড়ছে যে সতেরো বছর পর্যন্ত আমি ছিলাম শাহজাদী আর আজ একটা গরীব কাঙাল চাকরানি। সারা কেল্লার মধ্যে আমার বাড়িতে ছিল সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর কাপড়-চোপড় আর সবকিছুই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিন্তু আজ সবকিছুই উল্টে গেছে। ধাইমার বাড়িতে যে গয়না ও মণিমুক্তা পুঁতে রেখেছিলাম পরে গোপনে সেখানে খুঁড়ে দেখা গেল সবকিছুই গায়েব। কে জানে কে নিয়ে গেছে। বিগত যুগের কোনো জিনিসই আর রইল না। শুধু আমিই রইলাম পড়ে।’

‘এই সব চিন্তা ভাবনার এত বেশি প্রভাব পড়ল আমার ওপর যে মাথা ঘুরে উঠল আর আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। সকাল পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি। সকাল হলো, দেখলাম আমি তেমনি রয়ে গেছি যাকে সবাই কাঙাল বলে ডাকে। উনুনটাও সেই যাতে আমি রুটি সেঁকতাম আর সেই বাড়িতে সব কাজকর্মও ছিল যা আমাকে বাঁদিদের চেয়ে বেশি খেটে করতে হতো। তাই আমি বলতাম, যা দেখেছিলাম তা ছিল স্বপ্ন আর যা শুনি তা হলো গল্প...’

মাহ্ জামাল

'দিলশাদ, সুড়সুড়ি দিস না, ঘুমোতে দে। নামায কাযা হয়ে গেলে কী করি। ইচ্ছেই করছে না চোখ খুলতে।'

'ওগো সুড়সুড়ি আমি দিইনি। এই গোলাপ ফুলটা তোমার পায়ের তলায় চোখ কচলাচ্ছে।'

'এই ফুলটা আমি দলে-পিষে-চটকে ফেলব। এত ভোরে কেন জাগাস আমায়? এখনো আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সুন্দরীকে ডেকে দে একটু। বাঁশি বাজিয়ে হালকা সুরে আমাকে ভৈরবী শোনাক। গুলচমন কোথায়, হাত-পা টিপুক। তুই একটা গল্প বল।'

'গল্প শোনালে পথিক ভুলবে। দিনের বেলা গল্প বলা উচিত নয়। সুন্দরী এসে গেছে। গুলচমনকে ডাকছি। আম্মা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন যে এখনো মাহ জামালকে জাগাইনি। নামাযের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।'

সুন্দরী বাঁশি বাজাতে মাহ জামাল চোখ খোলে। চুলগুলো জড়ো করে হাসে তারপর ঘুম থেকে ওঠার দুআ পড়ে। নারগিস সালাম করে। জবাবে জামাল তাকে একটা চিমটি কাটে। আড়মোড়া ভেঙে ওঠে বসে ও বলে, 'দিলশাদ, আমি নারগিসকে চিমটি কাটলুম তো ও হাসল না কেন? মুখ কোঁচকাল। আয়, তুই আয়। তোর কান মলে দিই আর তুই খুব হাস।'

দিলশাদ উঠে পালায়, দূরে গিয়ে দাঁড়ায় আর বলে, 'এই নিন আমি খিলখিল করে হাসছি। আপনি ধরে নিন যে কান মলে দিয়েছেন।'

মাহ জামাল আবার আড়মোড়া ভাঙে আর হাসতে হাসতে গিয়ে চৌকির ওপর বসে পড়ে। ওযু করে। নামায পড়ে। উঠোনে বেরিয়ে আসে এবং বাগানের একটেরে একটি চৌকিতে বসে। কুরআন শরীফ পড়তে শুরু করে।

সমস্ত দাসী-বাঁদি বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে লেগে যায়। নাশতা তৈরি হয়।

মাহ জামালের কুরআন শরীফ পড়া যখন শেষ হয় মালিনী বাঁশের তৈরি একটা ডালায় কাঁচা লংকা নিয়ে পৌঁছায়। প্রথমে সে মাহ জামালের আলাই-বালাই নেয়, আশীর্বাদ দেয়ার পর বলে, 'শাহজাদী আজ আপনার লাগানো গাছে এই মরিচ ধরেছে। আপনাকে সালাম করতে এসেছি।'

ডালাটা মাহ জামাল হাতে নেয়। চাকরানিদের ডাকা হয় এবং মরিচের আবির্ভাবে সারা মহলে ধুম পড়ে যায়। নারগিস বলে, 'কেমন চুপচাপ পড়ে আছে যেমন মালকিন পালঙে শুয়ে থাকেন।' গুলচমন বলে, 'ডাল থেকে খসেছে, ঘর থেকে ছাড়াছাড়ি তাই এত মনখারাপ।'

মাহ জামাল বলে, 'মালিনীকে পোশাকের জোড়া দাও আর নতুন কাপড় পরাও। নগদ পাঁচটা টাকাও দিয়ো। আমার চারাগাছের প্রথম ফল ও এনেছে, ওকে মিষ্টিমুখ করিয়ে দাও।'

মালিনী পায় রেশমি পোশাকের জোড়া। রুপোর খাড়ু পরানো হয়। লাড্ডু খাওয়ানো হয়। পাঁচ টাকা নগদ ও একটা শাহী পানের খিলি পায়। দুআ দিতে দিতে সে বাড়ি যায়। ওদিকে আম্মাকে গিয়ে দাসী খবর দেয় যে মালকিনের গাছে প্রথম ফল ধরেছে। তিনি পাশের মহল থেকে এলেন। সঙ্গে উঁচু শ্রেণির মোগলানী দাসী। এসে মেয়ের আলাই-বালাই নিলেন। মাহ জামাল আদব করলে আম্মাও মরিচের খুব প্রশংসা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে কাঁচা মরিচের চর্চা চলতে থাকে।

মাহ জামাল খুরশীদ জামালের একমাত্র কন্যা। তাঁর বাবা মির্জা আলী গওহর ওরফে নীলী শাহ আলমের ছেলে আকবর শাহ সানীর ভাই যিনি মারা গিয়েছিলেন। খাওয়াসদের (বিশিষ্ট বাঁদি) পেটে তাঁর কয়েকটি সন্তান হয় কিন্তু বেগমের গর্ভে শুধু একটি মেয়ে এই মাহ জামাল জন্ম নেয়, তাও বুড়ো বয়সে। যখন মির্জা নীলী মারা যান, মাহ জামালের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এখন সে পনেরোতে পড়েছে। শ্যামলা রঙ, লম্বাটে মুখ, মাঝারি গড়ন; কালো চোখে মাদকতা, স্বরে একধরনের অনুভূতি-প্রবণতা। হেসে যখন কথা বলে, মনে হয়

যেন মর্সিয়া পড়া হচ্ছে, শুনে বুকে ব্যথা লাগে। খুবই চঞ্চল, দুষ্টু, আরামপ্রিয়, কিন্তু মৃদুস্বভাবের। আদরে সোহাগে প্রতিপালিত শাহজাদী। পিতৃহীনা একমাত্র মেয়ে। স্বভাবে একটু একরোখা ও জেদি। রোগা-পটকা শরীর। চলার সময় অস্বাভাবিকভাবে সামনে নুয়ে চলে, ফুলভরা ডালের মতো এদিক-ওদিক দুলে দুলে হাঁটে। পদে পদে হোঁচট খায়। দাসীরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ায়। বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বা ইন্নালিল্লাহ বলতে বলতে চলে।

ফুলওয়ালাদের উৎসব। বাহাদুরশাহ তাঁর নতুন যাফর মহলে থাকতেন। যা খাজা কুতুব সাহেবের দরজার কাছে তৈরি করা হয়েছিল। বেগমরা অন্দর মহলে। কিন্তু খুরশীদ জামাল ও মাহ জামাল অন্য বাড়ি নিয়েছিলেন। কেননা, মির্জা নীলীর সময় থেকেই বাহাদুরশাহর সঙ্গে তাঁদের বনি-বনা ছিল না। বাহাদুরশাহকে ইংরেজরা মাসিক একলাখ টাকা দিত। তা থেকে প্রতিমাসে একহাজার টাকা আলাদাভাবে খুরশীদ জামালকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। দিনকাল ছিল সস্তার। হাজার টাকা আজকালকার অনেক টাকার সমান। খুরশীদ জামাল ঐশ্বর্যের মধ্যে দিব্যি সুখে জীবনযাপন করছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় পাঙ্খা ওঠানো (উৎসব) হয় সেদিন মাহ জামাল বিকেলবেলা বারান্দায় চিকের আড়ালে বসেছিল। বাইরে শানাই বাজছে। দিল্লির হিন্দু-মুসলমান রং বেরঙের কাপড়-চোপড় পরে পাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। দোকানপাট সাজানো গোছানো।

মাগরিবের সময় হলে খুরশীদ জামাল বাঁদিদের দিয়ে বলে পাঠালেন যে আগে গিয়ে নামায পড়ে নাও তারপর তামাশা দেখো। মাহ জামাল ওঠে, যাওয়ার সময় দেখতে পায় একজন ফকির সাদা কফনী (একরকমের কাপড় যা গলা থেকে পা পর্যন্ত পরা হয়) পরে, ফ্যাকাশে মুখ, আঢাকা মাথা, খালি পা পাঙ্খার পাশ দিয়ে হেঁটে তাকে দেখতে দেখতে চলে গেল। তার চেহারা ও কফনী দেখে মাহ মাজাল ভয় পেয়ে গেল। নামাযের সময়েও মাথার মধ্যে তাই ঘুরতে থাকে। তামাশা দেখা শেষ হলে ঘুমোতে যায় কিন্তু রাতেও কয়েকবার কফনী দেখা দিল। ভোর হলো। হালকা জ্বর। মার কাছে খবর গেল। তিনি দুআ পড়ে ফুঁ দিলেন, সিন্দুক থেকে একটা তাবিজ বের করে গলার পরিয়ে দিলেন। ফকিরদের জন্য ভিক্ষা পাঠিয়ে দিলেন।

দুপুরবেলা জ্বর বাড়ল। মাহ জামাল বারে বারে চমকে ওঠে ও বলে, 'ওই বুঝি কফনীওয়ালা এল। সে আমাকে ডাকছে। মাগো, এদিকে এসো, ওই দ্যাখো দাঁড়িয়ে হাসছে।'

মা দাসীদের কাছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, 'একজন ফকির সন্ধ্যেবেলা কফনী পরে যাচ্ছিল। মালকিন নামাযের জন্য যখন উঠেন তখন চিকটা একটু সরে যায়। ফকির ওর দিকে কুটিল চাউনিতে দেখে। তারপর সে কোথাও চলে যায়।'

খুরশীদ জামাল চাকরদের হুকুম দিলেন, 'ওইরকম পোশাক পরা ফকির যেখানে পাও নিয়ে এসো।' চাকররা সারা মেলায় খুঁজে বেড়ায়। সন্ধ্যে হয় হয় তখন সেই ফকিরকে পাওয়া গেল। খুরশীদ জামাল তাকে পর্দার পাশে বসিয়ে মেয়ের হালচাল শোনালেন। সে বলল, 'আমাকে ভেতরে নিয়ে চলো। আমি মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেই ও ভালো হয়ে যাবে।'

খুরশীদ জামাল ভেতরে পর্দা করালেন। ফকিরকে পালঙের পাশে নিয়ে গেলেন। সে দুটো চোখ বন্ধ করে দুই গালে নিজের হাত রেখে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, 'এই যে তোমার মেয়ে ভালো হয়ে গেছে।'

দেখা গেল সত্যি জ্বর নেমে গেছে। মাহ জামাল উঠে বসে। খুরশীদ জামাল ও বাঁদিরা সবাই অবাক। ফকিরকে বসান হলো। কিছু টাকা ও দুই থাক কাপড় দান করা হলো। ফকির বলল, 'এ আমি নিই না। আমাকে মেয়ের মুখ দেখিয়ে দাও। নইলে আবার অসুখে পড়বে।'

প্রথমে খুরশীদ জামাল কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মনে পড়ল, ফকিরকে তো বাপের সমান মানা হয়। পর্দা সরানো হলো। মাহ জামাল ফকিরকে দেখলেন ও মাথা নিচু করে নিলেন। ফকির মাহ জামালকে দেখে, ঠায় দেখতেই থাকে। কিছুক্ষণ পরে 'ভালো হোক বাবা' বলে উঠে দাঁড়ায় ও চলে যায়।

সে ছিল তিরিশ বছরের যুবক। কিন্তু অসুস্থ মনে হচ্ছিল। মুখ অত্যাধিক ফ্যাকাশে। সাদা কফনী ছাড়া অন্য কোনো কাপড় ছিল না। মনে হচ্ছিল চোখ দুটো যেন কাঁদতে কাঁদতে ফুলে উঠেছে।

এই যুবকটা সেই মালিনীর ছেলে যে মাহ জামালের বাগানের দেখাশুনা করত। বছরখানেক আগে সে মাহ জামালকে বাগানে দেখেছিল। মাহ জামালকে দেখে আপনা আপনি তার মধ্যে যে কষ্টের শুরু নিজের দারিদ্র্য ও মাহ জামালের মর্যাদার কথা ভেবে তা কাউকে বলার সাহস হলো না তার।

ছয় মাস ধরে সে এই অশান্তি ভোগ করল। তারপর সে দেখা পেল এক হিন্দু যোগীর। তার কাছে সে তার মনের কথা বলল। যোগী তাকে একটি সাদা কফনী দিয়ে বললেন, এটা পরলেই তার সব কাজ সফল হবে। কফনী পরামাত্রই সে নীম মজযুব (অর্ধ উন্মাদ) হয়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে বনে চলে গেল। ছয় মাস জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল। ছয় মাস পরে সে যখন লোকালয়ে ফিরে এল তার দেখা হলো মাহ জামালের সঙ্গে। কিন্তু এখন তার চাউনিতে সেই শক্তি যা এক নজরেই মাহ জামালকে অসুস্থ করে দিল।

* * *

১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৭। একটি ঘোড়া গাড়ি নজফগড়ের কাছে দাঁড়িয়ে। উর্দি পরা কিছু সেপাই সেটা ঘিরে রয়েছে। এরা সবাই সৈন্যদলের সেপাই। এই ঘোড়াগাড়িতে খুরশীদ জামাল, মাহ জামাল ও দুটি বাঁদি বসে। বাইরে চারজন চাকর তালোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে। সেপাইরা বলছিল, ‘আমরা ভেতরে তল্লাসী নেব। এতে কোনো বিদ্রোহী লুকিয়ে আছে।’ বেগমের চাকররা বলছিল, ‘ভেতরে শুধু মেয়েরা আছে তাই আমরা পর্দা ওঠাতে দেব না।’ কথার পিঠে কথা থেকে লড়াই লেগে গেল। চাকররা তলোয়ার চালাতে শুরু করে এবং এমন লড়াই লড়ল যে তারা কেউ আর বেঁচে রইল না। সেপাইরা গাড়ির পর্দা তুলে দিল। মেয়েদের দেখল আর গয়নার বাক্স তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। এ ছাড়াও আরও যত জিনিস ছিল লুট করে নিয়ে গেল। চালক পালিয়ে গিয়েছিল। বাঁদিদের নিয়ে বেগম নজফগড়ের দিকে যাবেন এমন সময় কতকগুলো গুজর এসে তাঁদের কাছে গয়না ও কাপড় চাইল। বেগম বললেন, ‘আমাদের যথাসর্বস্ব সৈন্যেরা লুট করে নিয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে কিছুই নেই। তোমরা গাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে যাও।’ কিন্তু গুজররা কোনো কথাই শুনল না, তারা জবরদস্তি তাদের বোরখা খুলে ফেলে সমস্ত বাড়তি কাপড় চোপড় ছিনিয়ে নিল আর খুরশীদ জামাল ও তাঁর বাঁদিদের গালমন্দ করতে

শুরু করে। একজন খুরশীদ জামালের মাথায় মারল এক লাঠি আর অন্যরা বাঁদিদের ওপর লাঠি চালাতে লাগল। মাহ জামাল ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে কেউ কিছু বলে না। খুরশীদ জামালের মাথা ফেটে চৌচির, কাতরাতে কাতারাতে মারা গেলেন তিনি। দুটো বাঁদিও বাঁচল না বেদম প্রহার থেকে। মাহ জামাল একা দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখল। মাকে মরতে দেখে তাঁকে জড়িয়ে সে কাঁদতে থাকে। গুজররা মারপিট করে চলে গিয়েছিল। মাহ জামাল কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। জ্ঞান হলে সে দেখল, সেখানে না তাঁর মার লাশ আছে আর না বাঁদিদের। জঙ্গলও নয় সেটা। একটা ঘরের মধ্যে চারপায়ীতে শুয়ে আছে সে। সামনে একটা গরু বাঁধা। কিছু মুরগি উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের একজন মেওয়াতী সামনে বসে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। আবার কান্না পেল মাহ জামালের। সে মেওয়াতীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, 'আমার মা কোথায়?' মেওয়াতিনী বলে, 'সে মরে গেছে। তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। কিছু খাবে? পায়েস তৈরি হয়েছে, খেয়ে নাও।'

মাহ জামাল বলে, 'খিদে পায়নি আমার।' তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মেওয়াতিনী কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, 'মা, শান্ত হও। কাঁদলে কী হবে? তোমার মা আর বেঁচে উঠবে না। আমাদের কোনো ছেলেপিলে নেই। মেয়ের মতো রাখব তোমাকে। এ বাড়িটাকে নিজের ভেবে নাও। কে তুমি? তোমার বাপ কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলে?'

মাহ জামাল বলে, 'দিল্লির বাদশাহর খানদানের মেয়ে আমি। আমার আব্বা হুজুর মারা যান এগারো বছর আগে। আমরা বিদ্রোহের সময় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। নজফগড়ে আমাদের বাগানের মালী থাকে। তার বাড়ি যাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের। পথে প্রথমে সেনাবাহিনীর সেপাইরা লুটপাট করল তারপর গুজররা মা ও বাঁদিদের মেরে ফেলল।' বলতে বলতে আবার কাঁদতে শুরু করে সে।

কিছুদিন মাহ জামাল মেওয়াতিনীর কাছে সুখে দিন কাটায়। যদিও বিগত দিনগুলি মনে করে মাঝে মধ্যে সে কাঁদত কিন্তু মেওয়াতিনীর ভালোবাসার দরুন তার কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিল না। রান্না-বান্না কিছুই করতে হতো না, তৈরি

সেঁকা রুটি পেত। তবুও জামালকে এ বাড়ি ও এ বাড়ির আটপৌরে ভাব যেন দাঁত বের বরে কামড়াতে আসত আর পুরোনো দিনের জাঁকজমক মনে পড়ে যেত।

একদিন রাত্রে মাহ জামাল, মেওয়াতিনী ও তার স্বামী বাড়িতে ঘুমোচ্ছিল। পড়শির কুঁড়েতে আগুন লাগে আর সেখান থেকে এগিয়ে এদের চালাতেও আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ার গন্ধে মাহ জামালের ঘুম ভেঙে যায়, সে চিৎকার করে ওঠে। মেওয়াতী ও মেওয়াতিনী বাড়ির মাহ জামাল ছোটে বাড়ির বাইরে। বাড়ির জ্বলন্ত চালা হুড়মুড় করে পড়ে, তার মধ্যেই দুজন আগুন পুড়ে মারা যায়। বস্তির লোকেরা অনেক কষ্টে আগুন নেভায়। মাহ জামালের এই ঠিকানাও জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বস্তির লোকেরা সকালবেলা পুড়ে মরা দুটো লাশকে কবর দিল। মাহ জামালকে একজন মোড়ল তার বাড়ি নিয়ে গেল। তার ছিল দুটো বউ ও কয়েকটা বাচ্চা। মাহ জামালকে শোবার জন্য একখানা চারপায়ী দেওয়া হলো। সেদিন তো একরকম কেটে গেল। রাত্রে এক বউ বলে, 'ওরে ছুকরি, দুধটা উনুনের ওপর বসিয়ে দে।' অন্যজন বলে, 'এদিকে আয় তো। আমার বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দে।' একই সময়ে দু-দুটো হুকুম শুনে মাহ জামাল ঘাবড়ে যায়। সে তো কখনো চুলায় দুধ বসায়নি বা কখনো ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়ায়নি। তবুও দুধের হাঁড়িটা তুলে উনুনের ওপর রাখবার জন্য এগোয়। উনুনের কাছে এসে সে খায় হোঁচট, হাত থেকে হাঁড়ি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সমস্ত দুধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ শুনে মোড়লের বউ ছুটে আসে এবং বয়ে যাওয়া দুধ দেখে মাহ জামালকে গালাগালি ও মার দিতে শুরু করে।

মার খাওয়া ও গালমন্দ শোনা তার জীবনে এই প্রথম। মাহ জামাল থরথর করে কাঁপে। দুধ তার কাপড়েও পড়েছিল। কখনো সে নিজের কাপড়ের দিকে তাকায় কখনো মোড়লের বউ এর দিকে—যে তাকে একনাগাড়ে গাল পাড়ছিল।

শেষে দেয়ালে ঠেস দিয়ে সে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে। মাহ জামালকে কাঁদতে দেখে মোড়ল বউয়ের রাগ বেড়ে যায়, সে পায়ের জুতো

খুলে মাহ জামালের মুখের ওপর দু-তিন ঘা মেরে বলে, 'এবার তুই কান্নাকাটি করে আমাকে ভয় দেখাতে চাস? মড়ি ডাইনি কোথাকার। মেওয়াতিনীকে গিলেছিস। খোদা যেন আমার বাচ্চাদের ভালো রাখে, উনুনের সামনে দুধ পড়া বড় অলক্ষুনে। জানি না, তোর এখানে আসা আমাদের ওপর কী বিপদ ডেকে আনবে।'

মাহ জামালের মুখের ওপর জুতো পড়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে সে। দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে নেয়। এই সময়ে এসে গেল মোড়ল। গোলমাল শুনে সেও সেখানে এগিয়ে গেল। মাহ জামাল সেখান থেকে পালিয়ে নিজের চারপায়ীর কাছে গেল। মোড়ল ও তার বউ এসে দাঁড়াল দালানে। বউকে মোড়ল জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?' সে সমস্ত ঘটনা বলে। মোড়ল বলে, 'বাদ দাও। গরীব মেয়েলোক। ভুল করে ফেলেছে।' অন্য বউ বলে ওঠে, 'এ গরীব নয়, কামচোর। একে বললাম বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দে তো একবার সাড়া দিয়েই চুপ, যেন শোনেইনি কোনো কথা। একে তুমি বেগম বানিয়ে এনেছ না দাসী করে? যদি দাসী হয় তাহলে কাজ করতে হবে।' মোড়ল বলে, 'আমি তো বেওয়ারিস বলে নিয়ে এসেছি। কাজ করা উচিত এর। আমাদের একটা চাকরানির দরকারও ছিল।'

ভয়ে ভয়ে মাহ জামাল বলে, 'আজ পর্যন্ত আমি চাকরি কাকে বলে জানি না। আমাকে শিখিয়ে দাও। ভাগ্যের ফেরে এই দশায় পড়েছি। কিন্তু চাকরি করা কেউ শেখায়নি। আমার কাজ তো বাঁদিরা করত। আমি তো কোনো কাজই করিনি।' বলতে বলতে সে ডুকরে কাঁদতে থাকে।

মোড়ল বলে, 'কাঁদিস না, ধীরে ধীরে সব কাজই শিখে ফেলবি।' তারপর সে মাহ জামালকে কিছু খেতে দেয়। কিন্তু সে খেতে পারল না, না খেয়ে খালিপেটেই ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা মোড়লের বউ তাকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকি দেয় আর বলে, 'আরে উঠছিস না কেন? কত ঘুমোবি? উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার সময় হলো।'

মাহ জামালের মনে পড়ে যায় কীভাবে দিলশাদ, নারগিস, সুন্দরী তার ঘুম ভাঙাত। সেও এক সময় ছিল আর এও এক সময়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে বসে ও পুরোনো দিনের অভ্যাসমতো দু-চার বার আড়মোড়া ভাঙে।

মোড়লের বউ ঠেলা মেরে বলে, 'যত সব অপয়া, ওঠবার নাম নেই।' তখন মাহ জামাল বুঝতে পারে যে সে সত্যি দাসী হয়ে গেছে। শাহজাদী আর নেই। তখুনি উঠে পড়ে কিন্তু তার চোখ থেকে ক্রমাগত পানি পড়েই যাচ্ছে। মোড়লের দ্বিতীয় বউ বলে, 'এই মেয়েলোকটার এ বাড়িতে থাকা চলবে না। সব সময় চোখের পানি ফেলছে। বাচ্চা-কাচ্চার বাড়িতে এই অপয়াকে রাখা ঠিক নয়।' এরই মধ্যে মোড়ল এসে পৌছয় এবং বউদের তাড়া খেয়ে মাহ জামালকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

মাহ জামাল থতমত খেয়ে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, 'হে আল্লাহ, কোথায় যাই?' হঠাৎ সেই সময় তার মনে পড়ে মালিনীর কথা। সেও এই এলাকায় থাকে। মা তার কাছে থাকার জন্যই আসছিলেন।

মাহ জামাল এইসব ভাবছিল এমন সময় কফনী পরা ফকির সামনে থেকে এসে মাহ জামালকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং দাঁড়িয়েই রইল। এই সাক্ষাতের প্রভাব মাহ জামালের ওপর পড়ল অদ্ভুতভাবে এবং সেও বাকশূন্য হয়ে গেল। যদিও সে এমন সব বিপদ ও কষ্টের মধ্যে পড়েছে যে নিজের বিষয়ে তার কোনো হুঁশ নেই তবুও ফকির, তার কফনী ও লাল লাল চোখদুটো তাকে এমন বিহ্বল করে তোলে যে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ফকির বলে, 'মালিকা (মহারনি) আমার, এখানে কোথায় তুমি?' 'মালিকা আমার' সম্বোধন শুনে মাহ জামাল লজ্জায় মুখ অন্যদিকে করে বলে, 'আমার ভাগ্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।' তারপর সে তাবৎ ঘটনা শোনায়। ফকির বলে, 'আমার বাড়ি তো কাছেই কিন্তু আমি কখনো আপনার এ অবস্থার কথা শুনিনি। চলুন, আমার বাড়ি চলুন।'

মাহ জামাল তার পেছনে পেছনে যায়। বাড়ি গিয়ে সে মাহ জামালের বিষয়ে মালিনীকে বলে। মালিনী ছুটে এসে মাহ জামালের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ে ও ভক্তের মতো নিজেকে সমর্পিত করতে থাকে। তারপর অনেক সম্মান দেখিয়ে চারপায়ীতে বসিয়ে হালচাল জিজ্ঞেস করে ও বলে, 'বেগম, এ বাড়ি আপনার। আমার ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনাদের দৌলতেই খোদা আমাকে সম্পন্ন অবস্থায় রেখেছেন। এবার আপনিই এ বাড়ির মালকিন। আমি ও আমার ছেলে আপনার গোলাম।'

মালিনী নিজের সামর্থ্য অনুসারে মাহ জামালকে এত সুখে রাখে যে সে তার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। সে দেখে মালিনীর ছেলের কাছে দূর দূর থেকে রোগী আসে। ফকির তার কফনীর ওপর হাত ঘষে, নিজের দু-গালের ওপর রাখে, চোখদুটো কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে খোলে ও বলে, 'যাও তুমি ভালো হয়ে গেছ।' আর সব রোগীই দেখতে দেখতে ভালো হয়ে যায়।

মাহ জামাল কয়দিন ধরে এই তামাশা দেখে তারপর সে মালিনীকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমার ছেলের মধ্যে এ শক্তি কোত্থেকে এল। আমাকেও একদিন ও এমনি করে ভালো করে দিয়েছিল।'

মালিনী হাতজোড় করে বলে, 'বেগম যদি প্রাণভিক্ষার অভয় পাই তাহলে বলি।'

মাহ জামাল বলে, 'এখন আমি প্রাণভিক্ষা দেওয়ার কেউ নই। তুমি বলো, রহস্যটা কী, আমি জানতে চাই।'

মালিনী বলে, 'বেগম, আমার ছেলে আপনার প্রেমে পড়ে এবং আপনার বিরহে সে অনেক কষ্ট ভোগ করে। শেষকালে একজন ফকির তাকে ওই কফনীটা দেয়। এ তারই বরকত যা হাজার হাজার লোককে নিরাময় করেছে এবং খোদা আপনাকেও এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনা থেকেই।'

এই কথার প্রভাব জামালের ওপর প্রবলভাবে পড়ে আর কিছুদিন পরে সে মালিনীকে বলে কাজীকে ডেকে পাঠায় আর কফনীওয়ালাকে বিয়ে করে নেয়।

মালিনী সারাজীবন মাহ জামালের এমন সেবা-যত্ন করে এবং এত আদরে রাখে যে মাহ জামাল বলত, তার ছোটবেলার কথাও আর মনে পড়ছে না।

কিন্তু মালিনীর ছেলে কফনী পরা কখনো ছাড়েনি। সেই কফনীর নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর এইভাবে মাহ জামালের ঘুমন্ত ভাগ্যকে ওই কফনীই জাগিয়ে দেয়।

সাকীনা খানম

যে সময় নবাব ফোলাদ খানের মৃতদেহ টিলার যুদ্ধস্থল থেকে বাড়ি এল সে সময় তার পুত্রবধু প্রসব-পীড়ায় আক্রান্ত। সে সময় দিল্লিতে এমন কোনো বাড়ি ছিল না যেখানে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়েনি। বাহাদুরশাহর বিষয়ে সর্বসাধারণে এ কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল যে তিনি লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মাকবারায় চলে গেছেন।

নবাব ফোলাদ খান ছিলেন বনেদি আমীর। কিন্তু তার বাবা মঈনুদ্দীন আকবর শাহের দরবারে কোনো দোষে সাব্যস্ত হয়ে তার প্রকোপে পড়েন। মন্সব ও জায়গিরদারী খোয়ান। সে সময় ফোলাদ খানের ছিল জোয়ান বয়স, তিনি ইংরেজ সেনাদলে যোগ দেন। ফৌজে বিদ্রোহ হলে তিনিও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চলে যান। শেষ দিন তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করতে গেলেন। টিলার ওপর ছিল ইংরেজদের ঘাঁটি। বেশ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কামানের গোলার টুকরোর আঘাতে মারা যান। সেপাইরা তার মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে এসে দেখে যে তার পুত্রবধু প্রসবব্যথায় ছটফট করছে আর কোনো ধাই পাওয়া যাচ্ছে না।

ফোলাদ খানের জোয়ান ছেলে চারদিন আগে মারা যায়। বেচারি চারদিনের বিধবা। শাশুড়ি মারা গেছেন দু-বছর হলো। বাড়িতে শ্বশুর ছাড়া আর কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিল না। যখন তিনি রক্তে নেয়ে, চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর ছায়া মুখের ওপর নিয়ে বাড়ি এলেন তখন সাকীনা খানমের চোখের সামানে আঁধার ঘনিয়ে এল।

বাড়িতে সবই ছিল। একটার জায়গায় চার চারজন দাসী ছিল। শোনামাত্রই সাকীনা খানম 'হায়' উচ্চারণ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মৃতদেহ উঠোনে পড়ে। সেপাইরা দরজায় দাঁড়িয়ে। সাকীনা দালানের পালঙে অজ্ঞান। দুই দাসী সাকীনার শিয়রে ও পায়ের কাছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে। তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এবং খোদার এই ফয়সালা দেখে তারস্বরে কাঁদছে।

অল্প একটু পরে সাকীনা সংবিৎ ফিরে পায়। প্রসববেদনায় ব্যাকুল হয়ে সে দাসীকে বলে, 'যাও দেউড়িতে গিয়ে সেপাইকে বলো, কোনো ধাই খুঁজে নিয়ে আসুক।' দাসী দৌড়ে দেউড়িতে যায় এবং হায় হায় শব্দ করতে করতে ছুটে ফিরে আসে, বলে, 'বিবি, সেপাইদের গোরা খাকিরা (বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সেপাইদের জনসাধারণ এই নামেই ডাকত) ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর এই গোরা খাকি উর্দিধারীরা আমাদের বাড়ির দিকে আসছে।' সাকীনা বলে, 'মড়ি, দরজা তো বন্ধ করে আয়'। দাসী গিয়ে দরজা বন্ধ করে আসে। এবার ব্যথা বাড়ল ও সাকীনার একটি ছেলে হলো। কাছে না কোনো ধাই, না কোনো জিনিসপত্র। খোদা নিজেই মুশকিল আসান করে দিলেন। কিন্তু সাকীনা এই ধকলের চোটে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। দাসী তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে নাওয়ালো আর কাপড় জড়িয়ে কোলে নিল।

সাকীনার বয়স সতেরো বছর মাত্র, সোয়া বছর হলো বিয়ে হয়েছে। তার বাপের বাড়ি ফররুখাবাদে আর সে রয়েছে দিল্লিতে, যেখানে চলছে বিদ্রোহের হাঙ্গামা। জ্ঞান ফিরে এলে সে দাসীকে বলে, 'আমাকে একটু সাহায্য করো। উঠিয়ে বসিয়ে দাও।' দাসী বলে, 'বেটি, এমন কাণ্ড কোরো না, শুয়ে থাকো এখন। তোমার বসবার শক্তি কই এখনো?' সাকীনা বলে, 'আরামের কথা ভাবার সময় নয় এটা। না জানি কিসমতে আরও কী কী আছে।'

এ কথা শুনে দাসী মাথার তলায় হাত দিয়ে সাকীনাকে বসিয়ে দেয় আর কোমরের কাছে কোলবালিশ রেখে দেয়। সাকীনা প্রথমে নিজের বাচ্চাকে মমতাভরা চোখে দেখে যা তার দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মনস্কাম আর তার ইচ্ছে হলো সে নির্নিমেষ তার দিকে চেয়েই থাকে। কিন্তু সহসা সে লজ্জিত হয়ে শিশুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় যেন। উঠোনের দিকে তাকানোমাত্রই চোখে পড়ে ফোলাদের মৃতদেহ। তার উল্লাসে লাগে এক প্রচণ্ড ধাক্কা, সে হয়ে

উঠে ব্যাকুল আর সে উল্টোপাল্টা বকবক করতে শুরু করে। সে বলতে থাকে—

'দেখে নিন আপনার এতিম নাতিকে। যার জন্য অনেক আশা করে বসেছিলেন—সে জন্মেছে। এর বাবাকে কোলে তুলে কবরে শুইয়ে দিয়েছিলেন। একেও কোলে নিয়ে কবরে ঘুমিয়ে পড়ুন। একে আমি এই অবস্থায় কেমন করে কোথায় রাখব? এই পুঁচকে অতিথি জানে না, যে ঘরে সে এসেছে তারা কত বিপদগ্রস্ত। দিল্লিতে আপনিই ছিলেন আমার বাবা। আজ আপনিও মারা গেলেন। ফররুখাবাদে আমার বাবা আছেন কিন্তু জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই ছেলেটার বাপ আমার সংসার গুলজার করে রেখেছিল। তাকেও মেরে ফেলল একটা গুলি।'

এই সব বলার পর সাকীনার হঠাৎ কিছু মনে পড়ে। হৃদয়ের লুকানো এক বেদনায় কাতর হয়ে সে বা হাত বুকের ওপর রাখে ও ডান হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বালিশে ঠেস দিয়ে কাঁদতে শুরু করে আর কাঁদতে কাঁদতে সে. আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

একজন দাসী সাকীনাকে অজ্ঞান অবস্থায় ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোয় এই উদ্দেশ্যে যে কাউকে ডেকে যদি ফোলাদ খানকে কবর দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়। কিন্তু সারা গলি নির্জন থমথমে। একটিও লোক রাস্তায় চলছে না দেখে সে ইশারায় অন্য দাসীকে ডাকে ও বলে, 'খালা আপন প্রাণ বাঁচাও। চলো এখান থেকে পালিয়ে যাই। বিবির সঙ্গে থাকলে মিছেমিছে প্রাণটা যাবে।'

সে বলে, 'এমন দুঃসময়ে মালিককে ছেড়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানো নিমকহারামের মতো কাজ হবে এবং অবস্থা যখন এমন যে একটি অসহায় শিশু সঙ্গে রয়েছে।' প্রথম দাসী জবাব দেয়, 'তুমি কি পাগল? কার বিশ্বস্ততা? কার ভালোবাসা? প্রাণে বাঁচলেই সবকিছু। আমি তো যাচ্ছি। তুই যা বুঝিস কর। ইংরেজ সেপাই এখুনি এসে পড়বে। বাড়ি লুট করবে ও আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।' এ কথা শুনে অন্য দাসীটাও হয়ে উঠল কঠোর। সে তৃতীয় ও চতুর্থ দাসীকে ইশারায় কাছে ডাকলে। তারাও পালাবার জন্য তৈরি হলো। 'পালাচ্ছিই যখন তখন কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে নাও। সাকীনা তো

বেহুঁশ পড়ে। চাবি শিয়র থেকে নিয়ে সিন্দুকটা কুঠরি থেকে বের করে নিয়ে নেয়া যাক।'

যার কোলে বাচ্চা ছিল সে দয়ার্দ্র হয়ে বলে, 'একে কে রাখবে?' একজন বলে, 'মার কাছে শুইয়ে দে।' সে বলে, 'না খালা, আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' সবাই একস্বরে বলে ওঠে, 'সোবহানাল্লাহ্, নিজের প্রাণ বাঁচানো দায়, বাচ্চা সামলাবি কি করে? বাচ্চা না থাকলে সাকীনা ছটফটিয়ে মারা যাবে। তোর কি একটুও দয়া-মায়া নেই?' সেও জবাব দিল, 'তোমরা সাকীনাকে ছেড়ে যাচ্ছ, ওর জন্য তোমাদের মনে কি কোনো দয়ামায়া নেই? এই সোনার চাঁদকে ছেড়ে যাচ্ছ, ওর জন্য তোমাদের মনে কি কোনো দয়ামায়া নেই? এই সোনার চাঁদকে কেন নিয়ে যাব না? আমার মেয়েকে গিয়ে দেব, সে একে মানুষ করবে। তার বাচ্চা এই কিছুদিন হলো মারা গেছে। এখানে ছেড়ে গেলে সাকীনা তো মরবেই, বাচ্চাটাও মরবে।'

শেষ পর্যন্ত চারজনই নগদ টাকার সিন্দুক ও বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়—ছেড়ে যায় সাকীনাকে সেই বাড়িতে, যেখানে একটি মৃতদেহ ছাড়া আর কেউ ছিল না।

প্রসবের দরুন সাকীনা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। চার ঘণ্টা বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিল সে। রাত আটটায় যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন বাড়িতে চারদিকে অন্ধকার। সে চোখ মেলে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। যখন কিছুই দেখা গেল না, সে ভাবল যে সে মারা গেছে আর এ অন্ধকার কবরের। আচমকা তার মুখ থেকে কালেমা বেরিয়ে এল, সে বলতে শুরু করে, 'ইসলাম আমার ধর্ম, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। খোদাই আমার মালিক, তিনি এক এবং তার মতো আর কেউ নেই। হে আল্লাহ, আমি নির্দোষ। আমার কবর আঁধারে রেখ না, আমাকে জান্নাতের আলো দান করো।'

অল্প কিছুক্ষণ পরে সে আকাশে তারা দেখতে পেল আর বুঝতে পারল যে সে জীবিত। আর পালঙে শুয়ে আছে। তখন সে দাসীদের ডাকতে শুরু করে। যখন কেউই সাড়া দিল না তখন সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। উঠে বসল। হয় তার দুর্বলতা ছিল না বা হতে পারে এ কথা তার মনেই রইল না যে সে দুর্বল।

পালঙ থেকে নেমে আলো জ্বালিয়ে দেখে যে বাড়িতে কোনো লোক নেই। উঠোনে শ্বশুরের মৃতদেহ। এ ছাড়া কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

রাত্রে লাশ দেখে সে ভয় পেয়ে যায় ও চেঁচাতে শুরু করে। পাড়ায় কোনো লোক থাকলে তার চিৎকার শুনে ভেতরে আসত। কিন্তু পাড়ার সবাই আগেই পালিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে সাকীনা এত ভয় পেয়ে যায় যে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায় আর মেঝেতে আছড়ে পড়ে। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকালবেলা পর্যন্ত তার মূর্ছা ভাঙে না। সে মেঝের ওপর পড়ে থাকে। বেলা বাড়লে সে চোখ খোলে। সে সময় সে বুকে বল ফিরে পায়, যদিও কয়বেলা সে কিছু খায়নি, কারণ দুঃখ ও ভয় বিপদকালে মানুষকে শক্ত-সমর্থ করে তোলে। তা ছাড়া সৈনিক বংশের মেয়ে হওয়ার দরুন তার মন সাধারণ মেয়েদের মতো দুর্বল ছিল না। সে ভাবল, মৃতদেহটা গোর দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাক। খিদেয় তার গা এলিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তার মনে এল, বাচ্চা কই? এ কথা মনে পড়ামাত্র তার বুক মাতৃত্বের বেদনায় ডুকরে উঠল এবং সে পাগলের মতো দৌড়ে দৌড়ে সমস্ত বাড়ি খুঁজে বেড়াতে লাগল। যখন বাচ্চা কোথাও পাওয়া গেল না তখন সে পানির বড় বড় মটকার ঢাকনা খুলে তার মধ্যে উঁকি দিতে থাকে, যদি বাচ্চাটা তার মধ্যে থাকে। পালঙ থেকে বালিশ তুলে বুকে চেপে চেপে ধরে।

শেষ পর্যন্ত বিপদই আবার বুকে বল জাগায়। বুকে বল পাওয়ায় মনে কিছুটা সস্থিরতা এল, সে বাচ্চার কথা ভুলে গেল। আলমারি খুলে সে একটি সাদা চাদর বের করে ও শহীদের মৃতদেহকে তাই দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর জায়নামায বিছিয়ে সিজদায় মাথা নত করে কেঁদে কেঁদে বলে—

'হে খোদা, তোমারই এক বান্দার লাশ পড়ে আছে যে না-কাফন পেল, না-দাফন। তার নসীব, না তো সে কবর পেল, না পেল নামায। তোমার ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দাও, তারা নামায পড়ুক এবং তোমার করুণার মাঝে তাকে সমাধিস্থ করে দিক। আমার সঙ্গে ছল করল সবাই, আমার সম্রাটও চলে গেল অন্য দুনিয়ায়। আমার বুকের মানিককেও কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন তুমি ছাড়া আমার রক্ষক নেই। আমি অসহায়, আমার দুআ কবূল করো, আমার হাত ধরো।'

সাকীনা খানম তখনও সিজদার ভঙ্গিমায় আনত যখন দরজা খুলে খাকি উর্দি পরা চারজন সেপাই ভেতরে প্রবেশ করে। সাকীনা তৎক্ষণাৎ মাথা তোলে এবং পরপুরুষদের আসতে দেখে মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে এক কোণে লুকোতে চাইল কিন্তু সেপাইরা ততক্ষণ ভেতরে এসে গেছে। তারা সাকীনাকে ধরে ফেলে ও মুখ খুলে দেখে সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে, 'জোয়ান মেয়ে, এ তো যুবতী ও খুবই সুন্দরী।'

এরপর তারা সাকীনাকে ছেড়ে দিল ও সারা বাড়িতে তল্লাশী করতে লাগল। নগদ টাকা তো দাসীরা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গয়না-গাঁটি ও দামি কাপড় চোপড় লুট করল তারা। আঙিনায় লাশের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে বলে ওঠে, 'আরে এ তো কোনো দাগী বিদ্রোহী।'

তারপর সেপাইরা সাকীনাকে হাত ধরে উঠায় ও তাদের সঙ্গে যেতে বলে। সাকীনা কিছু বলল না। সেপাইদের জোর-জবরদস্তিতে নাচার হয় উঠে দাঁড়ায়। সে বলতে পারে না যে সে সদ্য-প্রসূতা। সে এও বলতে পারে না যে সে ক্ষুধার্ত। তার মুখ দিয়ে এও বের হয় না যে, বিরক্ত কোরো না। তার বনেদিয়ানা, ভদ্রতা ও আত্মসম্মান তাকে বাধা দেয় কিছু বলতে।

সেপাইরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যখন দরজার কাছে পৌঁছয় সাকীনা পেছনে ফিরে বাড়ির দিকে তাকায় ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'বিদায় তোমায় হে শ্বশুরবাড়ি, কাফন ও কবর থেকে বঞ্চিত শ্বশুরকে সালাম। আমি তলোয়ারধারীদের ঘরের বউ। তাঁরা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁদের ইজ্জত-আবরুর জন্য প্রাণ দিতেন।' সাকীনার এই করুণ কথা শুনে সেপাইরা হাসে আর তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়। কিছুদূর সাকীনা চুপচাপ চলে। তারপর বলে, 'আমি সদ্য-প্রসূতা। আমি ক্ষুধার্ত। করুণা করো আমার ওপর। আমিও তোমাদের দেশের। তোমাদেরই বোন। আমি নির্দোষ।'

এই শুনে চারজন সেপাই দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর অনুকম্পাভরা সুরে বলে, 'ঘাবড়াসনে! তোর জন্য কোনো যানবাহন যোগাড় করছি।' এই বলে তিনজন দাঁড়াল, একজন গিয়ে আহতদের বইবার গাড়ি নিয়ে এল এবং তাতে সাকীনাকে বসিয়ে টিলার ওপর ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

কেউ জানে না বিদ্রোহকালীন প্রসূতি সাকীনার বারো বছর কেমন করে কাটে, কোথায় কোথায় সে ছিল আর কোন কোন বিপদদের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। আমি যখন তাকে দেখি তখন সে রোহতকের এক পাড়ায় ভিক্ষা চাইছিল। তার পায়ে জুতা ছিল না। তার পায়জামা ছেঁড়া, কোর্তা খুবই ময়লা ও কয়েক জায়গায় তালি মারা। মাথা ঢাকার দোপাট্টা ছিড়ে ন্যাতার মতো হয়ে গেছে। মনে হয় অনেক দিন খায়নি। গায়ের চামড়া হাড়ের গায়ে বসে গেছে। চোখের পাশে গভীর কালো বৃত্ত। মাথার চুল উস্ক-খুস্ক। সৌন্দর্য রয়েছে কিন্তু লুণ্ঠিত। চোখে খোদার দেওয়া শোভা কিন্তু বিধ্বস্ত ও সন্তপ্ত। হাঁটতে গিয়ে মাথা ঘোরে, সে দেয়াল ধরে মাথা নিচু করে নেয়। চলতে গিয়ে পা নড়বড় করলে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে হাঁফ ছাড়ে, তারপর এগোয়।

কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ি। সেখানে বিয়ে। শ'য়ে শ'য়ে লোক দাওয়াত খেয়ে বেরিয়ে আসছে। সেখানে সে দাঁড়ায় তারপর আর্তস্বরে আওড়ায়, 'ভাগ্যের হাতে উৎপীড়িত আমি। বড় ঘরে জন্ম আমার। ইজ্জত খুইয়ে লাজ-শরম বিসর্জন দিয়ে রুটি খেতে এসেছি। আপনাদের কল্যাণ হোক সাহেব, আমাকেও দুটো খেতে দিন। এক লুকমা আমাকেও দিন।'

সাকীনার আওয়াজ ফকিরদের গণ্ডগোলে কেউ শুনতে পায় না ওপরন্ত একটা চাকর এমন এক ধাক্কা দিল যে সে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। পড়ার সময় অসহায় নারী কাতরে ওঠে, 'তিন দিন থেকে আমি কিছু খাইনি। আমাকে আর মারিস না—কিসমতই আমাকে মেরে রেখেছে। হে খোদা, কোথায় যাই। কাকে শোনাই আমার দুঃখ।' এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখছিল। সাকীনার দশা দেখে তার মনে করুণা জেগে ওঠে আর সেও অসহায়ভাবে কাঁদতে শুরু করে। সে গিয়ে হাত ধরে সাকীনাকে ওঠায় আর বলে, 'এসো, আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে খেতে দেব।'

সাকীনা অতি কষ্টে ছেলেটার ওপর ভর দিয়ে ওঠে। ছেলেটা কাছেপিঠের একটি বাড়ির চাকর। সে তাকে সেখানে নিয়ে যায় এবং বিয়ে-বাড়ি থেকে আনা নিজের ভাগের খাবার তার সামনে ধরে। সাকীনা দু-লুকমা খেয়ে পানি

খায়। চোখের অন্ধকার কেটে গেল। ছেলেটিকে হাজার বার দুআ দিতে থাকে সে।

ভালোভাবে ছেলেটিকে লক্ষ করামাত্রই তার বুক কেমন করে ওঠে আর সে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। ছেলেটিও সাকীনার বাহুপাশে কী রকম ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সাকীনা জিজ্ঞেস করে, 'কার ছেলে তুমি।' সে বলে, 'আমার মা এই বাড়ির দাসী আর আমিও এখানে চাকর।' সাকীনা জিজ্ঞেস করে, 'তোমার মা কোথায়?' ছেলেটা জবাব দেয়, 'সে আর নানি দুজনেই চৌধুরানীর সঙ্গে বিয়েতে গেছে। চৌধুরানীর বাড়িরই চাকর তারা।'

শুনে সাকীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে ভাবছিল এই ছেলেটার ওপর তার এত টান কেন? এ কথা সত্যি যে সে দয়া করেছে কিন্তু কেউ দয়া করলেই মানুষের মন তো এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে না।

ইতিমধ্যে ছেলেটির মা ও নানি বাড়ি ফিরে এল। সাকীনা অবিলম্বে চিনে ফেলল ছেলেটির নানি সেই দাসী যে বিদ্রোহের সময় তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়েছিল। দাসী সাকীনাকে চিনতে পারল না। কিন্তু সাকীনা তার নাম ধরে ডাকায় নিজের নাম ও অবস্থার কথা বলায় দাসী তার পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

ছেলেটা যখন জানতে পারল যে সে আদতে সাকীনারই ছেলে তখন সে আবার মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে সাকীনা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'হে মাওলা, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বিদ্রোহের সময় আমার সোনাকে বাঁচিয়ে রেখেছ আর বারো বছর পরে আমার দিন পাল্টালে।'

এরপর সাকীনা ফররুখাবাদে তার বাপের বাড়িতে চিঠি পাঠায়। সেখানে মা-বাবা তখন মারা গেছেন। তিন ভাই বেঁচে। তারা রোহতক এসে তাদের বোন ও ভাগ্নেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। দাসী ও তার মেয়ে অর্থাৎ যারা ছেলেকে পাল-পোষণ করেছিল তারাও সঙ্গে যায়। ফররুখবাদ পৌঁছে তারা স্বাভাবিক জীবন কাটাতে থাকে।

সবুজ পোশাকের বীরাঙ্গণা

দিল্লির সেই সব বৃদ্ধ যারা ১৮৫৭-এর বিদ্রোহের সময় যুবক ছিলেন সাধারণত গল্প করেন, সে সময় ইংরেজ সৈন্য টিলার ওপর ঘাঁটি তৈরি করেছিল আর কাশ্মীরী দরওয়াজার দিক থেকে দিল্লি শহরের বাজারে গুলিগোলা চালাত। সে সময় সবুজ পোশাক পরা একজন মুসলমান বৃদ্ধা শহরের বাজারে গিয়ে উঁচু আর গুরুগম্ভীর স্বরে বলত, 'এসো, চলো আল্লাহ তোমাদের জান্নাতে ডেকেছেন।'

শহরবাসীরা এই ডাক শুনে চারিদিকে জড়ো হতো আর তাদের সবাইকে নিয়ে সে কাশ্মীরী দরওয়াজার ওপর আক্রমণ করত, তারপর শহরবাসীর সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাত।

কিছু লোক, যারা এই ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, বলে, সে নারী অসম সাহসী ও নির্ভীক ছিল। মৃত্যুর ভয় মোটেই ছিল না তাঁর। গুলিগোলার বৃষ্টির মধ্যে সে বাহাদুর সেপাইদের মতো এগিয়ে যেত। কখনো সে পদাতিক, কখনো অশ্বারোহিণী। তাঁর কাছে থাকত বন্দুক, তলোয়ার ও একটি পতাকা। বন্দুক সে খুব ভালো চালাত। যারা তার সঙ্গে ঘাঁটিতে গিয়েছে তাদের মধ্যে একজন বলে, সে তলোয়ার চালাতেও খুব দক্ষ ছিল। কতবার দেখা গেছে সে সৈনিকদের সঙ্গে সামনা সামনি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে।

সেই নারীর বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখে শহরের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করত। যেহেতু যুদ্ধ করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের, তাই প্রায়ই তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে হতো। আর যখন তারা পালাত তখন এই নারী তাদের বাধা দিত কিন্তু বাধ্য হয়ে তাঁকেও ফিরে

আসতে হতো। ফিরে এলেও কেউ জানতে পারত না সে কোথায় যায় আর কোত্থেকে আসে।

এই ভাবে শেষ পর্যন্ত একদিন এমন হলো যে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় আক্রমণ চালাতে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ও তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সে ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল আর সেখানে ঘায়েল হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। ইংরেজ সৈনিকরা তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেয়। তারপর কেউ জানে না সে কোথায় এবং তাঁর হলো কী।

দিল্লি প্রদেশের সরকার কিছু ইংরেজি পত্র প্রকাশ করেছে যা দিল্লি ঘেরাও করার সময় ইংরেজ সামরিক অফিসাররা লিখেছিল। এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে একটা চিঠি লেফটেন্যান্ট ডবলু এস আর হাডসন সাহেবের যা তিনি দিল্লি ক্যাম্প থেকে ২৯ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে মিষ্টার জে. গিলসন ফরসাইথ, ডেপুটি কমিশনার আম্বালাকে পাঠিয়ে ছিলেন। এই চিঠিতে ওই মুসলমান বৃদ্ধার বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া আছে। পত্রের মন্তব্য অনেকটা এই ধরনের :

মাই ডিয়ার ফরসাইথ! তোমার কাছে একজন মুসলমান বৃদ্ধাকে পাঠাচ্ছি। অদ্ভুত ধরনের নারী, সবুজ রঙের পোশাক পরে লোকদের বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করত আর নিজেই হাতিয়ার নিয়ে তাদের নেতৃত্ব করে ঘাঁটির ওপর আক্রমণ করত।

যেসব সৈনিকের সঙ্গে ওর মোকাবিলা হয়েছে তারা বলে যে সে কয়েকবার সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে, বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে হাতিয়ার চালায় আর ওর শক্তি পাঁচটি পুরুষের সমান।

যেদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে শহরের বিদ্রোহীদের সৈনিক কায়দায় লড়াচ্ছিল। তাঁর বন্দুক দিয়ে সে অনেককে তাক করে করে মারে। সৈনিকরা বলে যে সে নিজেই বন্দুক ও তলোয়ারের আঘাতে আমাদের অনেক লোককে হতাহত করেছে কিন্তু যা আমরা ভেবেছিলাম তা-ই হলো, তাঁর সঙ্গীরা সব পালিয়ে যায় আর সে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। জেনারেল সাহেবের সামনে পেশ করা হলো তিনি ওকে নারী ভেবে মুক্ত করে

দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত্র করি, বলি, যদি একে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে এ শহরে ফিরে গিয়ে নিজের দৈবশক্তির বিষয়ে ঘোষণা করবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে বাঁধা লোকেরা এর মুক্তি কোনো দৈবশক্তির পরিণাম বলে মেনে নেবে, ফলত হতে পারে ছাড়া পাওয়ার দরুন এই নারী ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত নারীর মতো আমাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে—ফরাসি বিদ্রোহের ইতিহাসে যার উল্লেখ আছে। (ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময় জোয়ন অব আর্ক নামক নারী এই ভাবেই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। হাজার হাজার লোক তাকে দৈবশক্তির প্রতীক মেনে নিয়ে তার পক্ষ নেওয়াতে দারুণ যুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। জনসাধারণ ভাবত, এ নারী কখনো মরবে না। শেষে ফ্রান্সের বিরোধীদলের সেনারা তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে। তবেই উপদ্রব শান্ত হয়। সেই নারীর সংকেত পত্রে করা হয়েছে। –হাসান নিজামী।)

জেনারেল সাহেব আমার কথা মেনে নিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বন্দি করার আদেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটিকে আপনার কাছে তাই পাঠানো হচ্ছে। আশা করি আপনি একে কয়েদ করে রাখার সমুচিত ব্যবস্থা করবেন। কেননা, এ ডাইনি ভীষণ বিপজ্জনক। –হাডসন।

বাহাদুর শাহ যাফর

আমার মরহুমা মা তার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ গোলাম হুসাইন সাহেবের কাছ থেকে শোনা গল্প আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেন, যেদিন বাহাদুর শাহ দিল্লির কেল্লা থেকে বের হন তিনি সোজা হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় গিয়ে হাজির হলেন। সে সময় বাদশাহ বিচিত্র ভয় ও নিরাশায় আচ্ছন্ন। কয়েকটি বাছাই করা খোজা ও খোলা পালকির বেহারা ছাড়া কোনো লোক তাঁর সঙ্গে ছিল না। ভয়ে চিন্তায় বাদশাহর মুখ মলিন ও তাঁর সাদা দাড়িতে ধুলো-মাটি। বাদশাহর আসার খবর পেয়ে দাদাসাহেব দরগাহ শরীফে এলেন। দেখেন মঙ্গলময় সমাধির শিয়রের দিকেই দরজায় ঠেস দিয়ে তিনি বসে আছেন। বরাবরের মতো আমাকে দেখামাত্রই তাঁর মুখ স্মিত হয়ে উঠল। তারপর বললেন, 'আমি আগেই তোমাকে বলেছি এই বিদ্রোহী সেপাইরা বড্ড অবিবেচক আর তাদের বিশ্বাস করা বড় ভুল। নিজেরাও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে। শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো। মায়ামোহ ত্যাগ করে যদিও ফকিরের মতো পালিয়ে এসেছি তবু আমি সেই রক্তের স্মৃতি বহন করছি যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোকাবিলা করতে ভয় পায় না। আমার বাপ-দাদারা এর চেয়ে খারাপ সময় দেখেছেন কিন্তু তাঁরা সাহস হারাননি। কিন্তু আমাকে নেপথ্যে থেকেই যবনিকা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আমিই তৈমুরের শেষ চিহ্ন। মোগল শাসনের বাতি নিভুনিভু, আর কয়েক ঘণ্টার ব্যাপারমাত্র। অতএব জেনেশুনে অযথা রক্তপাত করি কেন? এই জন্য কেল্লা ছেড়ে চলে এসেছি। মুলুক খোদার, যাকে ইচ্ছা দিন। শত শত বছর ধরে আমাদের বংশ হিন্দুস্থানে হিম্মতের সঙ্গে প্রভুত্ব

করছে। এখন এসেছে অন্যদের সময়। তারা শাসন করবে, লোকে তাদের বাদশাহ বলবে। আর আমাদের বলবে ওদের হাতে পরাজিত। এ আফসোসের কথা নয়। আমরাও অন্যদের ঘর নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের ঘর তৈরি করেছিলাম।' এইসব নিরাশাভরা কথা বলার পর বাদশাহ একটা ছোট সিন্দুক দিলেন আমাকে আর বললেন, 'এই নাও, এ তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। আমীর তৈমুর যখন কুস্তুনতুনিয়া (কনস্ট্যান্টিনোপল) জয় করেন তখন সুলতান বায়েজিদের কোষাগার থেকে এই অমূল্য বস্তুটি পেয়েছিলেন। এতে হুজুর হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক দাড়ির পাঁচটি চুল আছে, যা আজ পর্যন্ত আমাদের বংশে একটি পবিত্র ও অমূল্য সম্পদরূপে রক্ষিত হয়ে এসেছে। এখন আমার মর্ত বা পাতাল কোথাও ঠাঁই নেই। এটা নিয়ে কোথায় যাব? এখন আপনি এর প্রকৃত অধিকারী। নিন, এটা রেখে দিন। এ আমার হৃদয় ও চোখকে স্নিগ্ধ করে রাখত, আজকের এই ভয়ানক বিপদে নিজের হাতেই একে হারাচ্ছি।'

দাদাসাহেব সিন্দুকটা নিয়ে নিলেন। দরগাহ শরীফে রেখে দিলেন সেটা। আজও তা সেখানে রয়েছে। অন্যান্য বহুমূল্য ও পবিত্র বস্তুর মতো প্রতি বছর সব হিজরীর তৃতীয় মাসে ভক্তদের দর্শন করতে দেওয়া হয়।

দাদাসাহেবকে বাদশাহ বললেন, 'আজ তিন বেলা হলো খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ পাইনি। যদি বাড়িতে কিছু তৈরি থাকে, এনে দাও।' দাদাসাহেব বললেন, 'তাঁরাও মৃত্যুর উপকূলে দাঁড়িয়ে। রান্না করার খেয়াল নেই। বাড়ি যাচ্ছি। যা কিছু আছে হাজির করছি। বরঞ্চ আপনিই চলুন না। যতক্ষণ আমি এবং আমার সন্তানরা জীবিত আছি ততক্ষণ কোনো লোক আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমরা মরে যাওয়ার পরই আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে।'

বাদশাহ বলেন, 'আপনি যা বলেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু এই বুড়ো হাড় আমানত রেখে কী লাভ! এবার দু-লুকমা খেয়ে নিয়ে হুমায়ুনের সমাধির দিকে রওয়ানা হব। সেখানে যা ভাগ্য লেখা আছে তা-ই হবে।'

দাদাসাহেব বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো খাবার তৈরি আছে কি?' বলা হলো, 'বেসনের রুটি ও সির্কার চাটনি আছে।' অগত্যা তা-ই একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা বড় থালায় সাজিয়ে নিয়ে আসা হলো। বাদশাহ ছোলার রুটি খেয়ে তিন বেলা পরে পানি খেলেন। এবং খোদার শোকর আদায় করলেন। তারপর হুমায়ুনের সমাধিতে পৌঁছে গ্রেপ্তারবরণ করলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল একজন আত্মতুষ্ট দরবেশের মতোন জীবন কাটিয়ে গেলেন।

মির্জা দিলদার শাহ

মির্জা দিলদার শাহ বয়ান করতেন যে যখন হযরত বাহাদুর শাহর ছেলে মির্জা মোগল ও অন্য শাহজাদাদের গুলি করে হত্যা করার পর তাদের মাথা কেটে তাঁর সামনে আনা হলো, তখন বারকোশে কাটামুণ্ড দেখে বাদশাহ অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, সার্থক হয়ে সামনে এলে। পুরুষ এই দিনের জন্যই সন্তান পালন করে।'

যিনি খবর এনেছিলেন তিনি বলেন, 'হ্যাঁ মশাই, সিপাহী বিদ্রোহের সময় আপনার বয়স কত ছিল?' মির্জা দিলদার শাহ বলেন, 'এই চৌদ্দ-পনেরো বছর। সমস্ত ঘটনাই আমার ভালো করে মনে আছে। আব্বাজান আমাকে নিয়ে গাজীয়াবাদ যাচ্ছিলেন। হিণ্ডন নদীর ওপর সৈন্যরা আমাদের ধরে ফেলল। মা ও আমার ছোট বোন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। বাবা তাদের থামালেন ও চোখ বাঁচিয়ে একজন সেপাইয়ের তালোয়ার উঠিয়ে নিলেন। তলোয়ার হাতে নিতেই চারদিক থেকে সেপাইরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু-চারজনকে তিনি ঘায়েল করলেন কিন্তু সঙ্গীন ও তলোয়ারের আঘাতে তিনি খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ হলেন।

যে সময় আমাকে মার কাছ থেকে আলাদা করা হলো তাঁর চিৎকারে আকাশ দুলে উঠল। বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন. 'ওরে আমার মানিককে ছেড়ে দে তোরা। আমার স্বামীকে তো তোরা মেরেই ফেললি। এবার এতিমের ওপর একটু দয়া কর। আমার বৈধব্য আমি কার ভরসায় কাটাব? আল্লাহ আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার বুকের ধন যায় কোথায়? কেউ গিয়ে আকবর ও শাহজাহানকে কবর থেকে ডেকে আনুক এবং

তাঁদের বংশের দুখিনীর দুর্গতির কথা শোনাক। দেখে যাও! আমার কলিজার টুকরোকে ওরা মুঠোয় পিষে ফেলছে। ওরে তোরা কেউ আয়। আমার কোলের বাছা আমায় দিয়ে দে।'

'আমার ছোট বোন ভাইজান বলে আমার দিকে ছুটে আসে। কিন্তু সেপাইরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যায়। আমাকে ঘোড়ায় রশি দিয়ে বাঁধে। ঘোড়া ছোটে, আমিও ছুটি। পা রক্তাক্ত, বুক ধড়ফড় করছে আর দম আটকে আসছে।'

জিজ্ঞেস করি, 'মির্জা, একটা কথা রয়ে গেল। তোমার মা ও বোনের কী হলো।' মির্জা বলে, 'আজ পর্যন্ত তাদের কোনো খবর পাইনি। জানি না তাদের কী হয়েছে আর তারা কোথায় গেছে?'

মির্জা কমর সুলতান

দিল্লির জামে মসজিদ থেকে যে রাস্তা মেটিয়া মহল ও চিতলি কবর হয়ে দিল্লি দরওয়াজার দিকে গেছে সেখানে আছে 'কল্লু খওয়াস কী হাবেলী' নামে একটি পাড়া। প্রতি রাত্রে অন্ধকার নেমে আসার পর এই পাড়া থেকে একজন ফকির বেরিয়ে জামে মসজিদ পর্যন্ত যায়। তারপর সেখান থেকে ফিরে আছে।

এই ফকির বেশ ঢ্যাঙা, রোগা-পটকা শরীর, আধপাকা দাড়ি, চুল সাদা ও গাল তোবড়ানো, চোখে দেখতে পায় না। ময়লা তালিমারা পায়জামা। পায়ে ছেঁড়া জুতো ন্যাতার মতো। কুর্তা খুবই ময়লা। তাতেও দশ-বারো জায়গায় তালি মারা। মাথায় লম্বা চুল কিন্তু উস্ক-খুস্ক। একটা ছেঁড়া টুপি মাথায়। ফকিরের এক হাতে বাঁশের একটা লাঠি আর অন্য হাতে মাটির পেয়ালা একটা—যার কানা একদিকে ভাঙা। মুখটা এতই ফ্যাকাশে যে চেহারা দেখে মনে হয় কয়েক মাস পরে আজই বিছানা থেকে উঠেছে। যখন চলে তখন ডান পা-টা ঘসটে ঘসটে এগোয়। বোধহয় কখনো পক্ষাঘাত হয়েছিল।

তার কণ্ঠস্বর খুবই উঁচু ও বেদনাভরা। যখন সে হতাশ গলায় উঁচু আওয়াজে আওড়ায় 'আল্লাহ, এক পয়সার আটা দে। তুই-ই দিবি।' তখন বাজারের লোকজন ও বাজারের কাছে পিঠের বাড়ির লোকেরা স্বতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যদিও তাদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া কেউ জানে না এ ফকির কে আর এর স্বরে এত বেদনা কেন ঝরে। কয়েক বাড়ির মেয়েরা বলতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যে হলো যেই, ওই অলক্ষুনে আওয়াজ কানে আসবেই। যখনই এ আওয়াজ শুনি আমার বুক ফেটে যায়। জানি না কে এ ফকির, হামেশা রাতেই ভিক্ষে চাইতে বেরোয়, দিনের বেলা কখনো এর আওয়াজ তো শোনা যায় না।

ফকির যখন কল্লু খওয়াস কী হাবেলী থেকে বাজারে আসে তখন সোজা জামে মসজিদের দিকে লাঠিতে ভর দিয়ে ডান পা টেনে ছেঁড়া জুতোয় ধুলো উড়িয়ে আস্তে আস্তে যায়। এক এক মিনিট অন্তর একটিই কথা তার মুখ থেকে বের হয়, 'আল্লাহ, এক পয়সার আটা দে।'

ফকির কোনো দোকান বা লোকের সামনে দাঁড়ায় না। সোজা চলতে থাকে। যদি কোনো পথিক বা দোকানদারের মনে করুণা জেগে ওঠে আর সে ফকিরের পেয়ালায় পয়সা, আটা বা কোনো খাবার দেয় তাহলে ফকির শুধু এইটুকু বলে, 'তোমার ভালো হোক বাবা, খোদা যেন তোমাকে খারাপ সময় না দেখান' তারপর এগিয়ে যায়। অন্ধ হওয়ার দরুন সে দেখতে পায় না ভিক্ষা কে দিল বা কী দিল।

জামে মসজিদ থেকে ফেরার পথে এই আওয়াজ দিতে দিতে সে কল্লু খওয়াস কী হাবেলীতে পৌঁছে যায়। এই হাবেলীতে গরীব মুসলমানদের অনেকগুলো আলাদা আলাদা ছোট ছোট বাড়ি আছে। এই বাড়িগুলোর মধ্যেই খুবই ছোট্ট ভাঙাচোরা একটি বাড়ি এই ফকিরের। বাড়ি ফিরে এসে দরজার শেকল খুলে সে ভেতরে যায়। এই বাড়িতে শুধু একটা দালান, একটা কুঠরি, একটা পায়খানা আর একটা ছোট্ট উঠোন। দালানে একটা ভাঙা চারপায়ী আর মেঝেতে একটা ছেঁড়া কম্বল পাতা।

দিল্লিওয়ালারা জানেই না, কে এই ফকির? শুধু দু-চারজনই জানে যে সে বাদশাহ বাহাদুর শাহর পৌত্র এবং তার নাম মির্জা কমর সুলতান। বিদ্রোহের আগে সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং কেল্লায় তার সৌন্দর্য ও লম্বা গড়নের খুব জাঁক ছিল। ঘোড়ায় চড়ে যখন সে বেরুতো তখন কেল্লার মেয়েরা ও দিল্লির বাজারের লোকেরা পথ চলতে চলতে থমকে যেত। তার সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখত। সবাই নুয়ে পড়ে তাকে সালাম করত।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, 'মির্জা, তুমি দিনের বেলা বাইরে কেন বের হও না?' শাহজাদা কমর সুলতান জবাব দেন, 'এক কালে যে বাজারে আমার রূপ ও জমকালো যানবাহনের জাঁকজমক ছিল সেই বাজারে এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দিনের বেলা বেরোতে লজ্জা করে। সেই জন্য রাতে বাইরে বেরুই এবং শুধু খোদার কাছে চাই এবং তাঁরই সামনে হাত পাতি।'

'বিদ্রোহের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কীভাবে কাটালে? এর বৃত্তান্ত শোনাও না কিছু।' কেউ এমন প্রশ্ন করলে এ শুনে কমর সুলতান একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে যেত এবং কিছুক্ষণ পরে বলত, 'সে কথা আর বোলো না, স্বপ্ন দেখছিলাম, হঠাৎ চোখ খুলে গেল। এখন জাগছি এবং সে স্বপ্ন আর কখনো দেখা হলো না, দেখার আশাও নেই।'

মোগল সম্রাজ্ঞী

পাকিজা সুলতান বেগম ও তাহেরা সুলতান বেগম

একবিংশে তৈমুর বংশের শেষ স্মারক

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য অস্তমিত হয়েছে ২৫০ বছরেরও বেশি আগে—সেই সুবাদে সম্রাজ্ঞী খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয় কিন্তু এরপরও আছেন সম্রাজ্ঞী। শেষ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ যাফরের পৌত্রী পাকিজা সুলতান বেগম এবং তার বোন্ তাহেরা বেগম এখনো বেঁচে আছেন। দিল্লির নিতিবাগে স্বামীগৃহে আছেন পাকিজা সুলতান বেগম ৫৬। স্বামী সুপ্রতিষ্ঠিত আইনজীবী মি. ডানিয়েল লতিফি।

ইতিহাস যদি পাতা উল্টিয়ে না দিত তাহলে পাকিজা সুলতান বেগম বা তাহেরা সুলতান বেগমই জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আজ দিল্লির সিংহাসন অলঙ্কৃত করতেন। তাদের মা কামাল সুলতান বেগম বাস করেন পুরোনো দিল্লিতে। পাকিজা সুলতান বেগম প্রায়শ লন্ডনে তার বোনের বাড়িতে অবকাশযাপন করেন।

মোগলরা বা সর্বশেষ তৈমুর বংশীয় যারা জীবিত আছেন তারা বিয়ে করেন নিজেদের মধ্যেই এবং এখানো যারা জীবিত আছেন তারা কোনো না-কোনোভাবে সম্রাট বাবর-এর সেনাবাহিনীর সদস্যদের সন্তান। পাকিজা সুলতান বেগমের মা কামার সুলতান বেগম হলেন মীর্জা ফরখন্দা জামালের কন্যা এবং মীর্জা ফখরুর পৌত্রী। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন। সম্রাটের অন্যান্য পুত্রকন্যাদেরকে বৃটিশ শাসকগণ আগেই শেষ করে দিয়েছে। বাহাদুর শাহ যাফরকে বার্মার রেঙ্গুনে নির্বাসন দেওয়া হয় ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের পর।

পাকিজা সুলতান বেগম এর পিতা ছিলেন একজন বাবরী মোগল। মোগল ঐতিহ্যের ধারক তার পিতা এবং পিতামহ দুজনেই পাঞ্জাবের পালি'র গভর্নর ছিলেন। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ এই মোগল স্বাধীনতার পরও নিজেদের বিশাল সম্পত্তির অংশবিশেষও দাবি করেননি, তিনি দিল্লিতে একটি ক্ষুদ্র বাড়ি ক্রয় করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। পাকিজা সুলতান বেগম-এর পিতা অত্যন্ত ধার্মিক চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তার মৃত্যু হয় যখন পাকিজার বয়স মাত্র ছয়। মোগল ঐতিহ্যের ধারা এই সর্বশেষ মোগলদের মধ্যেও প্রবাহিত হয়েছে। পুরুষদের মতো মোগল নারীগণও উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা ও নিশানাবাজি ইত্যাদিতে পারদর্শী হন।

পাকিজা সুলতান বেগম আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন এবং হোস্টেলে থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাস্টার্স এবং গ্রন্থবিজ্ঞানে আরও একটি ডিগ্রী নেন। এর পাশাপাশি তিনি ফারসি এবং উর্দুতেও ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পড়াশোনা শেষে লেডি শ্রীরাম কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর তিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন এবং সর্বশেষ একজন ডিরেক্টর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। কর্ম উপলক্ষে তিনি নানা দেশ সফর করেন এবং আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

অত্যন্ত পর্দানশীন এই মোগল পরিবারের দুই সদস্য বরাবরই বোরকা পরে চলাচল করেন। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঙ্গার কারণে অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী বোরকা পরিত্যাগ করতে বলতেন। কিন্তু পাকিজা সুলতান বেগমদের পরিবর্তন ছিল মন্থরগতির। মি. লতিফি আজীবন স্ত্রীর পেশা ও কাজে এবং আফ্রিকা বিষয়ে বরাবর সহায়তা করে গেছেন। দেশবিভক্তির পর মোগল উত্তরসূরিরা প্রায় সকলেই যখন আমেরিকা, কানাডা, পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমাচ্ছিলেন তখনো কামার সুলতান বেগম ভারতবর্ষ ছেড়ে যাননি। দুই কন্যাসন্তানসহ তিনি এখানেই থেকে যান।

এ সম্বন্ধে পাকিজা বেগমের নিজের বক্তব্য, 'আমরা দিল্লি ছেড়ে যাব কেন? এই যে সাম্রাজ্য, মোগল ঐতিহ্যের চিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে আছে যে নগর, এ তো আমাদের। আমরা একে সৃষ্টি করেছি। এমনকি আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি

আধিপত্যবাদের কারণে বেহাত হলেও স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ পর্যন্ত আমরা নিইনি। দেশের স্বার্থে আমরা তা ত্যাগ করেছি।' তার বক্তব্য হলো স্বাধীনতা মানে মুক্তি এবং গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সমাজে সকলের সমান অধিকার। বিশেষত যেখানে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত।

সেই সুবাদে ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক নতুন সরকারেরও পাকিজা বেগমের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। বাহাদুর শাহ যাফরের মৃত্যু শত বার্ষিকীর জাতীয় অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন বিশেষ অতিথি।

পাকিজা সুলতানের শৈশব কেটেছে পুরোনো দিল্লিতে। আজকের নিতিবাগের তুলনায় সে এক ভিন্নজগৎ। দারিয়াগঞ্জের জনগণের মধ্যে এখনো রয়েছে মোগলদের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি। এখনো মোগলদের আগমনে তারা রাস্তায় দু-ভাগ হয়ে যায়। গাড়ি থেমে যায় এবং কেউ তাদের পিঠ দেখায় না। তাই এখনো তিনি যখন বাড়ি যান, হয়ে যান অন্য মানুষ। চাকর-বাকররা ছুটে আসে এবং পানিটি পর্যন্ত গড়িয়ে খেতে হয় না। চাকররা রয়েছে সব কাজ করার জন্য—এই অভ্যাস এবং ঐতিহ্য নিয়ে পাকিজা সুলতান বেগম যখন লন্ডনে বোনের বাড়ি বেড়াতে যান এবং বোনকে দেখেন সব কাজ করতে, কষ্টই পান এবং বোনকে তাই অনুরোধ করেন দেশে এসে কিছুকাল থাকার জন্য যেখানে তিনিও হতে পারেন সম্রাজ্ঞী। যদিও লন্ডনপ্রবাসী আজমের তাহেরা সুলতান বেগমের কাছে এই ঐতিহ্যের কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

মোগল ঐতিহ্য অনুযায়ী কামার সুলতান তার বিয়েতে উপঢৌকন হিসেবে পেয়েছিলেন সাম্রাজ্য, কিছু গহনা এবং আওরঙ্গজেবের তরবারি। ওপরন্তু মোগলদের সংস্কার এবং ঐতিহ্য—যেমন মোগল উৎসব নওরোজী লালকেল্লার নববর্ষের উৎসব। এই উৎসবেরও একটা সংস্কার আছে যা কিনা তুর্কীদের থেকে এসেছে। এখনো পর্যন্ত নববর্ষের উৎসবের একটা বিশেষ দিক হলো একটা বিশেষ চিন্তাধারা নিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। যেমন পোশাকের রঙ হলুদ নির্ধারিত হলে সকলেরই পোশাক হলুদ হতে হবে। যদি উৎসবের

স্থানটি লাল বা হলুদ ফুলে আচ্ছাদিত হতে হয় তবে তা-ই হবে এবং খাদ্যদ্রব্যের বেলায়ও তা-ই। খাবারের সব রঙ হবে এক। এই উৎসবে মোগলরা সাধারণত একটা নির্দিষ্ট বাড়ি বা বাগানে একটা নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হন, মুনাজাত শেষে সকলেই এক সঙ্গে খানাপিনা করেন।

বলাবাহুল্য, এই সব রীতি মোগল পরিবারের সদস্য যারা এখনো ইন্ডিয়াতে বসবাস করছে তাদের। বাইরের জগতের মোগলরা অবশ্য ভিন্নতর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন ইতোমধ্যে। তাহেরা বেগম একজন অ-মোগলকে বিয়ে করে প্রবাসী হয়েছেন অথচ পাকিজা সুলতান বেগম পারিবারিক ঐতিহ্য ত্যাগ না করে দিল্লিতেই থেকে যান মায়ের পাশে এবং বিয়ে সুবাদেও তিনি দিল্লি ছেড়ে যাননি।

এই মোগল ঐতিহ্য—দিল্লির সুপ্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন আজ অবধি মোগল সাম্রাজ্যের জয়গান গেয়ে চলছে। যমুনার তীরে তারই ঐতিহ্য এবং গর্ব নিয়েই বেঁচে আছেন আজকের পাকিজা সুলতান বেগম।

অস্তমিত মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ যাফরের কবর হয়েছে রেঙ্গুনে এবং তার সমাধিস্থল খালি পরে আছে দিল্লিতে।

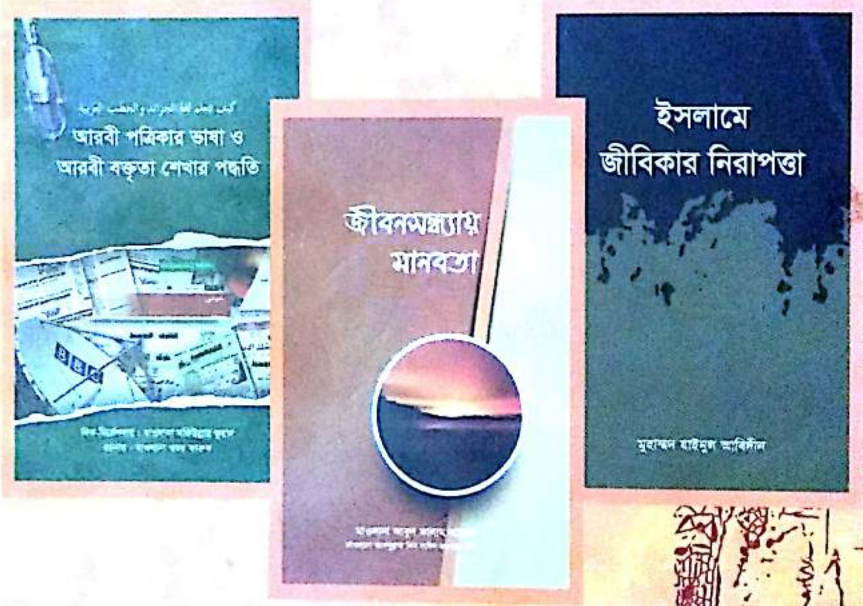
‘-হে সম্রাট কবি
এই তব হৃদয়ের ছবি
এই তব নব মেঘদূত
অপূর্ব অদ্ভুত-’

তথ্য : Femina থেকে

সমাপ্ত



রাহনুমা প্রকাশিত কয়েকটি বই



ISBN 978-984-92211-4-2

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।